সম্পর্ক

পূর্ব্বাচল
কলিকাতা-৯

প্রকাশক : শ্রীসুধীন্দ্র চৌধুরী
৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

মুদ্রাকর : শ্রীধনঞ্জয় দে
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৪৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

সঞ্জিত ঘোষ
স্নেহাস্পদেষু

সম্পর্ক

নভেম্বরের গোড়াতেই এ বছর জাঁকিয়ে হিম পড়তে শুরু করেছে।

শীতটা যে এবার অনেক আগে আগেই এসে যাবে সেটা রীতিমতো টের পাওয়া যায়। হিমালয় এই শহর থেকে কয়েক শ কিলোমিটার দূরে কিন্তু উত্তুরে বাতাস এর মধ্যেই কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফ গায়ে মেখে এখানে হানা দিয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিনের মতো আজও কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় তাঁর নীল অ্যামবাসাডরটা ড্রাইভ করে ময়দানে এলেন ইন্দ্রনাথ। তাঁর পাঁচ বন্ধু বা ভ্রমণসঙ্গী বিমলেশ, সুধাময়, সত্যজিৎ, আনন্দগোপাল এবং রাজশেখর তাঁদের নিজস্ব গাড়িতে এসে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে অপেক্ষা করছিলেন। ইন্দ্রনাথ আসতেই যে যাঁর গাড়ি মেমোরিয়ালের উলটো দিকে পার্ক করে রেসকোর্সের দিকে হাঁটতে শুরু করেন।

রেসকোর্স বাঁয়ে রেখে ফোর্ট উইলিয়ামের পাশ দিয়ে রেড রোড হয়ে ওঁরা সোজা চলে যাবেন রাজভবনের কাছে, সেখান থেকে আকাশবাণী ভবনের সামনে দিয়ে গঙ্গার ধারে। ওখানে মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে রাস্তার ধারের কোনো চা-ওলার কাছ থেকে এক ভাঁড় করে চা খেয়ে ফেরার পালা। যে রুট দিয়ে যাচ্ছেন সেটা ধরেই সাড়ে পাঁচটাব ভেতর ভিক্টোরিয়ার সামনে ফিরে আসবেন। শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস এই রুটিনের এতটুকু হেরফের হবার উপায় নেই। কেউ যদি বাড়াবাড়ি রকমের অসুস্থ হয়ে পড়েন কিংবা কোনো কারণে কলকাতার বাইরে যান তো আলাদা কথা।

অন্যেরা তবু মাঝে মাঝে আসেন না। সেদিক থেকে ইন্দ্রনাথ একেবারেই ব্যতিক্রম। অটুট স্বাস্থ্য তাঁর। গত আঠার-কুড়ি বছরে চার-পাঁচ দিন বাদ দিলে কখনও প্রাতঃভ্রমণ বন্ধ রাখেননি। এমন কি ঘোর বর্ষায় কলকাতা যখন ভেসে গেছে তখনও ময়দানে চলে এসেছেন। ভারত বন্ধ, বাংলা বন্ধও তাঁকে চার দেওয়ালে আটকে রাখতে পারেনি। ছেলেমেয়ের বিয়ের সময় গোটা বাড়ি জুড়ে যখন তুমুল ব্যস্ততা তখনও কলকাতার হৃৎপিণ্ডের মতো এই ঘন সবুজ অবারিত ময়দান ভোরবেলায় দুরন্ত আকর্ষণে তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে। প্রাতঃভ্রমণটা তাঁর বহুকালের প্রিয় অভ্যাস।

ইন্দ্রনাথের বয়স সবে পঁয়ষট্টি পেরিয়েছে। প্রায় ছ'ফিটের মতো হাইট। গায়ের রং বাদামি। এই বয়সেও ত্বকের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়নি। ধারাল নাক, চওড়া কপাল, লম্বাটে মুখ। চোখের দৃষ্টি এখনও আশ্চর্য সতেজ। খালি চোখে বইটই পড়তে

অসুবিধা হয় না, তবে দূরের কিছু দেখতে হলে চশমা লাগে। ধবধবে সুগঠিত দাঁতের একটিও বাঁধানো নয়, সবই তাঁর নিজস্ব। চুল বেশির ভাগই কালো, ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটে রুপোর তার। পরনে ক্রিম রঙের ট্রাউজার্সের ওপর বুশ শার্ট এবং পুলওভার, পায়ে মোটা সোলের কেডস। তাঁকে ঘিরে রয়েছে শান্ত এক ব্যক্তিত্ব। পাঁচ বছর আগে তিনি রিটায়ার করেছেন।

ইন্দ্রনাথের অন্য পাঁচজন সঙ্গীর বয়স বাষট্টি থেকে সাতষট্টির ভেতর। অর্থাৎ তাঁর চেয়ে কেউ দু'এক বছরের বড়, কেউ বা ছোট, কেউ সমবয়সী। তাঁর মতো এঁরাও অবসর নিয়েছেন। কর্মজীবনে সবাই ছিলেন অত্যন্ত কৃতী এবং সফল মানুষ। সরকারি চাকরিতে এঁদের দু'জন ডিপার্টমেন্টাল সেক্রেটারি পর্যন্ত হয়েছিলেন, একজন ছিলেন মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির লিগ্যাল অফিসার, একজন একটা ফার্মাসিটিউক্যাল কনসার্নের ডেপুটি ফিনান্স কন্ট্রোলার, আরেকজন একটা বিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের ভাইস প্রেসিডেন্ট। ইন্দ্রনাথের কথা এখন নয়, পরে।

এই পাঁচ ভ্রমণসঙ্গীর শরীরে কিন্তু অনেকদিন ধরেই ভাঙচুর শুরু হয়ে গেছে। সত্যজিৎ এবং আনন্দগোপালের প্রচণ্ড সুগার, দিনে দেড় ঘণ্টা হেঁটেও তিনশ'র নিচে নামানো যাচ্ছে না। সুধাময়ের কিডনির গোলমাল। বিমলেশ বারো মাসই প্রায় হাঁপানিতে ভোগেন। রাজশেখরের পেটে স্টোন হওয়ায় দু-দু'বার অপারেশন হয়ে গেছে। বয়সের তুলনায় এঁদের অনেক বুড়োটে দেখায়। ইন্দ্রনাথের মতো ট্রাউজার্স-শার্ট-পুলওভার তো পরেছেনই, হিমের প্রতিষেধক হিসেবে এই নভেম্বরেই তাঁদের মাথায় উঠেছে পশমের কান-ঢাকা টুপি, গলায় কমফোর্টার।

এখনও রোদ ওঠেনি। চারদিক কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে আছে। রেসকোর্সের গ্যালারি, ভিক্টোরিয়ার মাথার পরী, দূরে চৌরঙ্গির হাইরাইজ কিংবা কার্জন পার্কের এধারে মনুমেন্টের চূড়া, সব কিছুই অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো।

গোটা ময়দান জুড়ে এই শীতের ভোরে প্রচুর লোকজন চোখে পড়ছে। প্রাতঃভ্রমণের নেশা শুধু ইন্দ্রনাথ এবং তাঁর পাঁচ বন্ধুরই নেই, রোদ ওঠার অনেক আগেই এই শহরের হাজার হাজার মানুষ বিশুদ্ধ অক্সিজেনের সন্ধানে ময়দানে হানা দেয়। এই মুহূর্তে আগাগোড়া গরম পোশাকে-মোড়া এই মানুগুলোকে গাঢ় কুয়াশায় অচেনা, অলৌকিক প্রাণীর মতো মনে হয়।

ফোর্ট উইলিয়ামের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ইন্দ্রনাথরা রেড রোডে চলে এসেছিলেন। ইন্দ্রনাথের ডান দিকে সত্যজিৎ, আনন্দগোপাল এবং বিমলেশ, বাঁ ধারে সুধাময় আর রাজশেখর।

উলটো দিক থেকে মাঝে মাঝে দু'একটা প্রাইভেট কার হেড-লাইট জ্বালিয়ে খুব

সন্তর্পণে, প্রায় বুকে হেঁটে হেঁটে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। কুয়াশার কারণে পঞ্চাশ গজ দূরত্বের কোনো কিছুই যখন স্পষ্ট নয় তখন যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হচ্ছিল ইন্দ্রনাথদের। গাড়ি-টাড়ি গায়ের ওপর এসে যাতে না পড়ে সেজন্য রাস্তার ধার ঘেঁষে তাঁরা হাঁটছিলেন।

ইন্দ্রনাথকে মাঝখানে রেখে পাঁচ বন্ধু অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিলেন। রোজ ভিক্টোরিয়ার সামনে থেকে মর্নিং ওয়াক শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বকবকানিও আরম্ভ হয়। স্টার্টিং পয়েন্টে ফিরে না আসা পর্যন্ত ওটা চলতেই থাকে। একেক সময় ইন্দ্রনাথের মনে হয় পাঁচ বন্ধু যেন পাঁচটি টকিং মেশিন। অথচ কর্মজীবনে যখন তাঁরা অত্যন্ত দায়িত্বশীল অফিসার, তখন মেপে মেপে কথা বলতে হতো। অনাবশ্যক একটি শব্দও উচ্চারণ করতেন না। রিটায়ারমেন্টের পর সেটা বিপুল উৎসাহে পুষিয়ে নিচ্ছেন। কথাবার্তায় যাবতীয় সংযম ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

আনন্দগোপাল বলছিলেন, 'শুনছি, ব্যাঙ্ক এক পারসেন্ট করে ইন্টারেস্ট বাড়াচ্ছে। কিন্তু ইউনিট ট্রাস্টে ইনভেস্ট করা অনেক বেশি প্রফিটেবল। তোমরা কী বল?'

সত্যজিৎ বলেন, 'আমরা ওপিনিয়ন যদি নাও, নাম-করা সাউন্ড কোম্পানির কিছু শেয়ার কিনে ফেল। ফিফটি-সিক্সটি পারসেন্ট পর্যন্ত ডিভিডেন্ড দিচ্ছে।'

আনন্দগোপাল বলেন, 'সে তো তুমি আগেও অনেকবার বলেছ কিন্তু আমার সাহস হয় না। কখন কোন কোম্পানি লাটে উঠবে তার ঠিক নেই। ব্যাঙ্ক বা গভর্নমেন্টের নানা স্কিমে টাকা লাগানোটা অনেক সেফ। ইন্টারেস্ট টিন্টারেস্ট হয়তো কম পাওয়া যায় কিন্তু তোমার সারা জীবনের সেভিংস মার যাবে না। বেশি লোভ করে শেষটায় মারা পড়ব নাকি?'

বিমলেশ বলেন, 'তুমি চিরকালের ভীতু। আরে বাবা, রিস্ক না নিলে পয়সা হয়? গুজরাটিদের দেখ, পাঞ্জাবিদের দেখ—কী বেপরোয়া ওরা। রিস্ক না নিয়ে নিয়ে বাঙালি জাতটা গেল।'

ইন্দ্রনাথের বাঁ ধারে তখন রাজশেখর বলছিলেন, 'পেটে আবার পেইন শুরু হয়েছে ক'দিন ধরে। দুপুরে লাঞ্চের পর ওটা ভীষণ বেড়ে যায়। আবার যদি স্টোন ধরা পড়ে, আমি গেছি। দু-দুটো মেজর অপারেশন হয়ে গেছে। থার্ড টাইমে আর বাঁচব না।'

সুধাময় বলেন, 'আমার একটা কথা শুনবে?'

'কী?'

'বেলেঘাটায় আমার বড় শালার গুরুদেব এসেছেন। তিনি নাকি সিদ্ধপুরুষ। শিষ্যদের শুধু মন্ত্রই দেন না, নানারকম গাছগাছড়া, শেকড়বাকড়, তাবিজ-কবচ দিয়ে

ক্রনিক রোগ টোগ সারিয়েও দেন। আমার শাশুড়ি কয়েক বছর ধরে হার্টের ট্রাবলে ভুগছিলেন। মুড়ি-মুড়কির মতো ট্যাবলেট আর ক্যাপসিউল খেতেন কিন্তু কিছুই হচ্ছিল না। শেষে গুরুদেবের কবচ ধারণ করে এখন পুরোপুরি সুস্থ। বড় শালাকে দিয়ে গুরুদেবের কাছ থেকে একটা ডেট নিচ্ছি। আমার সঙ্গে তুমি বেলেঘাটায় যাবে।'

'তোমার শাশুড়ির মতো.কবচ পরতে হবে নাকি?'

'পরলে যদি অপারেশন করতে না হয়, পরবে।'

রাজশেখর হঠাৎ খেপে ওঠেন, 'তুমি না গভর্ণমেন্টের একজন ডিপার্টমেন্টাল সেক্রেটারি ছিলে?'

সুধাময় হকচকিয়ে যান। বলেন, 'তাতে কী হয়েছে?'

'তুমি ওই সব তাবিজ-কবচের বুজরুকিতে বিশ্বাস কর? চার বছর তো রিটায়ার করেছ। এর মধ্যেই সেনিলিটিতে ধরে গেল!'

'আহা, অত রেগে যাচ্ছ কেন? এই সব সাধু-সন্ন্যাসীদের অনেক রকম সুপারন্যাচারাল পাওয়ার থাকে। একবার গেলে দোষ কী?'

'তুমি হাজার বার যাও, আমি বাধা দিচ্ছি না। আমাকে টানাহ্যাঁচড়া করো না। মেডিক্যাল সায়েন্সের এই অ্যাডভান্সমেন্টের যুগে কিনা তাবিজ-কবচ! তুমি না একজন এডুকেটেড র‍্যাশনাল মানুষ!'

ইন্দ্রনাথের দু'পাশে অসংখ্য শব্দের বিস্ফোরণ চলেছে। এ শুধু আজই নয়, গতকাল, তার আগের দিন, তারও আগের দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর রোজই এক কথা, একই বিষয়, একই প্রসঙ্গ। সেভিংস, ব্যাঙ্ক ইন্টারেস্ট, ডিভিডেন্ড, শেয়ার, নইলে অসুখবিসুখ, ডাক্তার, অপারেশন, উইল, অলৌকিক ক্ষমতাওলা গুরু, রাজনৈতিক নেতাদের নৈতিক অধঃপতন, করাপশান, নেপোটিজম, খুন, ডাকাতি, ধর্ষণের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সব প্রসঙ্গ ইন্দ্রনাথ এত বার শুনেছেন যে এখন আর কোনো আগ্রহ বোধ করেন না। তাঁর কাছে এগুলো অসার কিছু শব্দের সমষ্টি মাত্র—নেহাতই অর্থহীন এবং অপ্রয়োজনীয়। প্রাতঃভ্রমণের মতো এসব শোনাও তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

অন্যদিন বন্ধুদের কথার ফাঁকে ফাঁকে টুকরো-টাকরা মন্তব্য করেন ইন্দ্রনাথ কিন্তু আজ একেবারেই চুপচাপ। বেশ দূরমনস্ক মনে হচ্ছিল তাঁকে, ভেতরে ভেতরে হয়তো একটু চঞ্চলও, তবে বাইরে থেকে তা বোঝার উপায় নেই।

আজ ভোরে ময়দানে বেরুবার ঠিক আগে নিউ ইয়র্ক থেকে বড় ছেলে

অশোকের ফোন এসেছিল। এটা চাঞ্চল্যকর কোনো ঘটনা নয়। কেননা প্রতি সোমবার ভোর সাড়ে চারটেয় অশোকের ফোন আসে. ঠিক আড়াই মিনিট সে কথা বলে। আট বছর ধরে এটা যেন নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। এর এদিক-ওদিক কখনও ঘটেনি। ইন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গীদের মতো অশোকও ফি সপ্তাহে আড়াই মিনিট ধরে প্রায় একই কথা বলে আসছে। 'বাবা, আমরা ভাল আছি। তুমি কেমন আছ? তোমার বৌমা মাস কমিউনিকেশনে বা আমেরিকান টেলিভিসনের একটা প্রাইভেট চ্যানেলে বিরাট অফার পেয়েছে। আমরা এবার আমেরিকান ন্যাশনালিটি পেয়ে গেছি। রণি এ বছরও স্কুলে খুব ভাল রেজাল্ট করেছে, বনির এবার সেকেন্ড ইয়ার।' ইত্যাদি। রণি এবং বনি অশোকদের ছেলে এবং মেয়ে। কিন্তু আজ ভোরে এ ধরনের কথা প্রায় একটিও বলেনি সে। ইন্দ্রনাথের শরীর-স্বাস্থ্য কেমন আছে জেনে নিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছে, 'আসছে শুক্রবার দুপুরে তুমি বাড়ি থাকছ তো?'

ইন্দ্রনাথ বলেছেন, 'দুপুরে কখনও আমি বাইরে বেরুই না।'

'ঠিক আছে।'

'কী ব্যাপার রে?'

'এখন বলছি না, শুক্রবার তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব।'

কী জাতীয় সারপ্রাইজ জানার আগেই আড়াই মিনিটের লং ডিসটান্স কলটা হঠাৎ কেটে যায়। তারপরও মিনিট দশেক ফোনের কাছে বসে ছিলেন ইন্দ্রনাথ। কিন্তু অশোক আর যোগাযোগ করেনি।

আট বছরে চার শ ষোল বার আমেরিকা থেকে ফোন করেছে অশোক। একটি সপ্তাহও বাদ যায়নি। কিন্তু কোনো বারই এমন কিছু বলেনি যা ইন্দ্রনাথের বিস্ময়বোধকে উসকে দিতে পারে। শুক্রবার দুপুরে চমকপ্রদ কী এমন ঘটতে পারে? কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না ইন্দ্রনাথ। একবার ভেবেছিলেন, তক্ষুনি নিজেই অশোককে ফোন করে জেনে নেবেন। পরক্ষণে স্থির করেছেন, এত ব্যগ্রতার দরকার নেই, শুক্রবার পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন।

শেয়ার ডিভিডেন্ড ইত্যাদি নিয়ে হৈচৈ করতে করতে হঠাৎ বিমলেশের নজর এসে পড়ে ইন্দ্রনাথের ওপর। বলেন, 'কী হে, আজ কী হলো তোমার, একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করলে নাকি?'

ইন্দ্রনাথ সামান্য চমকে ওঠেন। মৃদু হেসে বলেন, 'আরে না না, তোমরা বলছ, আমি শুনছি। দু'একজন ভাল শ্রোতাও তো দরকার। সবাই বললে শুনবে কে?'

আনন্দগোপাল তীক্ষ্ণ চোখে ইন্দ্রনাথকে লক্ষ করছিলেন। বলেন, 'আজ প্রথম থেকেই তোমাকে লিটল বিট আনমাইন্ডফুল মনে হচ্ছে। এনি প্রবলেম?'

'নো, নট অ্যাট অল।'

'অশোকের ফোন এসেছিল?'

এই ছয় ভ্রমণসঙ্গী পরস্পরের যাবতীয় খবর রাখেন। ইন্দ্রনাথ বলেন, 'নিশ্চয়ই। আমার সোমবারের রুটিন তো ওর ফোন দিয়েই শুরু।'

আনন্দগোপাল ইন্দ্রনাথের অন্যমনস্কতা সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন করেন না। বলেন, 'ওদের খবর-টবর সব ভাল তো?'

ইন্দ্রনাথ মাথা সামান্য হেলিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ।'

আনন্দগোপাল এবার মজার গলায় বলেন, 'ম্যাডাম মুখার্জি এখন কোথায় আছেন? সিডনি, নিউ ইয়র্ক, লন্ডন না টোরোন্টোতে?'

ম্যাডাম মুখার্জি বলতে সুপ্রভা মুখার্জি, ইন্দ্রনাথের স্ত্রী। তিনি পালা করে চার মহাদেশের চার মেট্রোপলিসে অনবরত ঘুরে বেড়ান। তাঁর কাঁধে অদৃশ্য দুটি ডানা যেন জোড়া রয়েছে। সারা বছর তিনি শুধু উড়ছেনই। সুপ্রভাই বোধহয় একমাত্র ভারতীয় ললনা যিনি ফি বছর চার মহাদেশে চার মাস করে কাটান। এর নিশ্চয়ই কিছু কারণ রয়েছে। সেটা পরে।

গত সপ্তাহে সুপ্রভা ছিলেন নিউ ইয়র্কে, অশোকের কাছে। এখনও সেখানে আছেন কিনা, সে সম্বন্ধে জোর দিয়ে বলা অসম্ভব। আজ সকলে অশোক যখন ফোন করেছিল তখন জেনে নেওয়া হয়নি। ইন্দ্রনাথ বলেন, 'ঠিক বলতে পারছি না। হয়তো নিউ ইয়র্কেই আছে।'

ওধার থেকে বিমলেশ বলেন, 'তোমাদের মতো আশ্চর্য কাপল্ হোল ওয়ার্ল্ডে আর পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।'

সত্যজিৎ বলেন, 'স্বামী কলকাতা থেকে নড়বেন না, পূর্বপুরুষের ঘাঁটি আগলে পড়ে থাকবেন। আর স্ত্রী ফ্লাইং সসারের মতো এক কন্টিনেন্ট থেকে আরেক কন্টিনেন্টে উড়ে চলেছেন। ম্যাডাম মুখার্জির নিশ্চয়ই নানা দেশের এয়ারলাইনাসে ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের মতো মান্থলি টিকেট কাটা আছে, তাই না?'

ইন্দ্রনাথ উত্তর দেন না, শুধু হাসেন। বাকি সবাই গলা মিলিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'যা বলেছ।'

রাজশেখর এমনিতে বেশ গম্ভীর মানুষ। কিন্তু বন্ধুদের কাছে এলে তাঁর বয়সটা হঠাৎ অনেক কমে যায়। তখন এক ধরনের ফিচলেমি যেন তাঁর ওপর ভর করে। ভালমানুষের মতো মুখ করে বললেন, 'ম্যাডাম মুখার্জির সঙ্গে তোমার লাস্ট কবে দেখা হয়েছিল ইন্দ্রনাথ?'

ইন্দ্রনাথ একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করেন, 'কেন বল তো?'

'প্রশ্ন না করে উত্তর দাও।' ভারি গলায় রাজশেখর বলেন।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'দু'বছর তিন মাস আগে কলকাতায় এসেছিল, তখন লাস্ট দেখা হয়েছে। তবে ফোনে প্রত্যেক সপ্তাহে কথা হয়।'

তারিফের ভঙ্গিতে রাজশেখর বলেন, 'ফাইন, ফাইন। তোমরা দেখালে বটে। দশ-পনের হাজার কিলোমিটার দূরে থেকে শুধু ফোনে দাম্পত্য জীবন চালাতে আর কাউকে শুনেছি বলে তো মনে হয় না।'

সুধাময় বলেন, 'গিনেস বুকে ওদের নাম তোলা দরকার। কনজুগাল লাইফের নানারকম মডেল হোল ওয়ার্ল্ডে রয়েছে। বাট দিস ইজ ইউনিক, আনহার্ড-অফ। হাজব্যান্ড-ওয়াইফের এমন রিলেশানের কথা আগে আর কেউ শোনেনি।'

রাজশেখর চোখ কুঁচকে বলেন, 'আমি কিন্তু খুব চিন্তিত সুধাময়।'

সুধাময় কিসের একটা সংকেত পেয়ে চনমনে হয়ে ওঠেন, 'কেন, কেন?'

'ম্যাডাম মুখার্জি যেভাবে ফোরেনে পড়ে থাকছেন, কোনোদিন হয়তো খবর আসবে নাগরিকত্ব আর পদবি পালটে ফেলেছেন। আছেন ইন্ডিয়ান, হয়তো হয়ে গেলেন কানাডিয়ান, ব্রিটিশ বা অস্ট্রেলিয়ান। মুখার্জির বদলে নামের সঙ্গে হয়তো জুড়ে গেল হাডসন, সাইমন কিংবা প্যাকার। ওদের দেশে বয়সটা তো কোনো ব্যাপার না। এক ডজন নাতি-নাতনির ঠাকুমা, সত্তর বছরের বুড়ি আশি বছরের এক বুড়োকে পাকড়ে সেজেগুজে চার্চে গিয়ে ড্যাং ড্যাং করে বিয়ে করে এল। সুতরাং ইন্দ্রনাথ মুখার্জি সাহেব, খুব সাবধান।'

এ জাতীয় মোটা দাগের রগড় নতুন কিছু নয়। বছরের পর বছর শুনে আসছেন ইন্দ্রনাথ। বহুকাল ধরে ব্যবহারের কারণে এগুলোর ধার এবং অন্তর্নিহিত মজা নষ্ট হয়ে গেছে। সেভাবে এখন আর হাসি পায় না। তবু দুই ঠোঁট দু'ধারে ছড়িয়ে হাসির একটা ভঙ্গি করেন ইন্দ্রনাথ। মুখে অবশ্য কিছু বলেন না।

ইন্দ্রনাথকে নিয়ে মজা করতে করতে সবাই গঙ্গার ধারে এসে রুটিন মাফিক এক ভাঁড় করে চা খান। তারপর আগের রুট ধরে ফের যখন ভিক্টোরিয়ার সামনে চলে আসেন, কুয়াশা কেটে যেতে শুরু করেছে। চৌরঙ্গির দিকের বিশাল বিশাল স্কাইস্ক্রেপারগুলোর ওধারে কেউ যেন অদৃশ্য ব্রাশ টেনে টেনে হালকা লালচে আভা ফুটিয়ে তুলছে।

'আচ্ছা, এবার বাড়ি ফেরা যাক। কাল আবার দেখা হবে।' বলতে বলতে ইন্দ্রনাথরা অন্য দিনের মতো রাস্তার উলটো দিকে পার্কিং এরিয়ায় গিয়ে যে যাঁর গাড়িতে উঠে পড়েন।

ইন্দ্রনাথ থাকেন নর্থ ক্যালকাটায়, বাকি সবাই দক্ষিণে। সত্যজিৎ এবং সুধাময়

ভবানীপুরে, রাজশেখর রিচি রোডে, বিমলেশ ওল্ড বালিগঞ্জে আর আনন্দগোপল আলিপুরে।

নীল অ্যামবাসাডরে স্টার্ট দিয়ে ইন্দ্রনাথ ভিক্টোরিয়া ডাইনে রেখে, বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামের পাশ দিয়ে চলে আসেন চৌরঙ্গিতে। রাস্তা এখনও বেশ ফাঁকা। খানিক আগের তুলনায় গাড়ি-টাড়ি একটু বেশি চোখে পড়ছে। মিল্ক সাপ্লাই আর খবরের কাগজের ভ্যান, কর্পোরেশনের লরি গাঁক গাঁক করতে করতে বেপরোয়া ভঙ্গিতে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া নানা ধরনের প্রাইভেট কার এবং বাস-টাস তো আছেই।

স্টিয়ারিংয়ে হাত আর উইন্ডস্ক্রিনের বাইরে চোখ রেখে বসে ছিলেন ইন্দ্রনাথ। বন্ধুরা সঙ্গে নেই। পুরনো সেই চিন্তাটা আবার নতুন করে তাঁর মাথায় ফিরে এল। আসছে শুক্রবার কী ধরনের চমক দেবে অশোক?

দুই

চৌরঙ্গি থেকে সোজা চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউতে চলে এলেন ইন্দ্রনাথ। স্টেটসম্যান বিল্ডিংয়ের পাশ দিয়ে সোজা তাঁকে শ্যামবাজারের দিকে যেতে হবে। যদিও কলকাতার শিরদাঁড়ার মতো এই রাস্তাটা জুড়ে পাতাল রেলের কাজ চলছে, তবু এই সকালবেলায় ট্রাফিক জ্যামের সম্ভাবনা নেই।

একসময় বৌবাজার, হ্যারিসন রোড, গিরিশ পার্ক এবং গ্রে স্ট্রিটের ক্রসিংগুলো মসৃণ গতিতে পরপর পার হয়ে ডান পাশের যে চওড়া রাস্তায় ইন্দ্রনাথের অ্যামবাসাডর চলে এল সেটার নাম চন্দ্রভূষণ মুখার্জি রোড। চন্দ্রভূষণ ছিলেন তাঁর বাবার ঠাকুরদা।

রাস্তাটার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় বিশাল 'মুখার্জি সদন'। নাইনটিনথ সেঞ্চুরিতে চন্দ্রভূষণ এই বাড়িটি তৈরি করিয়েছিলেন। তারপর মুখার্জি বংশের পাঁচটি জেনারেশান বা প্রজন্ম পার হয়ে গেছে। বাড়িটার সামনের দিকে প্রকাণ্ড লোহার গেট। গেটের পর অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। সেখানে একসময় ফোয়ারা, পরী এবং ফুলের বাগান ছিল। ফোয়ারা আর পরী কবেই ভেঙেচুরে গেছে। তবে বাগানটা আছে।

বাগান পেরুলে গথিক স্ট্রাকচারের তেতলা। শ্বেত পাথরের আঠারোটা স্টেপ উঠলে মোটা মোটা পিলার বসানো চাতাল। চাতালটাও সাদা পাথরের। শোনা যায়,

প্রায় দেড়শ বছর আগে জয়পুর থেকে এই সব পাথর আনানো হয়েছিল। চাতালের পর কারুকার্য-করা প্রকাণ্ড দরজা। সেটা দিয়ে ভেতরে ঢুকলে হাজার স্কোয়ার ফিটের ড্রইংরুম, তার মাঝখান দিয়ে দোতলায় যাবার কাঠের সিঁড়ি, যার ধারগুলো এবং রেলিং চকচকে পেতলের প্যানেল করা। ড্রইংরুমের দু'ধারে সারি সারি বেডরুম, যেগুলোর প্রতিটির সঙ্গে রয়েছে অ্যাটাচড বাথ। তাছাড়া কিচেন, ডাইনিং হল, ইত্যাদি। প্রতিটি ঘরের ফ্লোর নকশা-করা টাইলস দিয়ে মোড়া। বিরাট বিরাট জানালায় খড়খড়ি এবং রঙিন কাচের পাল্লা। দেওয়ালে আর সিলিংয়ে চমৎকার পঙ্খের কাজ। দোতলা আর তেতলাও হুবহু একতলার মতোই। পুরনো আমলের মেহগনি আর সেগুন কাঠের আসবাব দিয়ে গোটা বাড়িটা সাজানো। একেবারে পেছন দিকে কমপাউন্ড ওয়ালের ধার ঘেঁষে গ্যারেজ, ড্রাইভার এবং অন্য সব কাজের লোকদের জন্য একতলা নিচু ব্যারাক।

এই কলকাতা শহরে দেড়শ বছর আগে যে সব বিশাল বিশাল ম্যানসন তৈরি হয়েছিল তার বেশির ভাগই এখন ধ্বংসস্তূপ। কিন্তু 'মুখার্জি সদন' এত কাল বাদেও ঝকঝকে, তকতকে। কোথাও তার ক্ষয়ের চিহ্ন নেই। তিন-চার বছর পরপর আগাগোড়া বাড়িটা রং করা হয়। দেওয়াল বা সিলিংয়ে চিড় ধরলে বা প্লাস্টার খসে পড়লে তক্ষুনি মেরামত করে ফেলেন ইন্দ্রনাথ। গোটা বাড়িটার সর্বত্র প্রচুর যত্নের ছাপ।

গেটের সামনে একটু উঁচু টুলের ওপর বসে ছিল দারোয়ান ধানোয়ার সিং। লোকটা শিশোদীয় রাজপুত। সাড়ে ছ ফিটের মতো হাইট, চওড়া কাঁধ, গালপাট্টা এবং মোমে-মাজা গোঁফ তার মুখটাকে রীতিমতো ভীতিকর করে তুলেছে। পরনে কড়া ইস্তিরির খাকি ফুল-প্যান্ট এবং শার্টের ওপর মোটা উলের নীল পুলওভার। মাথায় পাগড়ি, পায়ে ভারি বুট। বয়স সত্তরের কাছাকাছি কিন্তু এখনও শিরদাঁড়া টান-টান। পঁচিশ বছর বয়সে বিহার থেকে 'মুখার্জি সদন'-এ নৌকরি নিয়ে এসেছিল সে, তারপর পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত একই পোশাকে গেট পাহারা দিয়ে চলেছে। মাঝখানে রান্না-খাওয়ার জন্য দু'ঘণ্টা বাদ।

ইন্দ্রনাথের নীল অ্যামবাসাডরটা দেখামাত্র অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে উঠে দাড়ায় ধানোয়ার। তারপর দ্রুত গেট খুলে দেয়, ধাতব শব্দ করে লোহার পাল্লাদুটো দু'দিকে সরে যায়।

গাড়ি ভেতরে এনে বাগানের পাশ দিয়ে শ্বেত পাথরের স্টেপগুলোর তলায় দাঁড় করান ইন্দ্রনাথ। তারপর দরজা খুলে নিচে নেমে ধীরে ধীরে একটার পর একটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরের চাতালে উঠে আসেন।

চওড়া চাতালটা পেরিয়ে একতলার ড্রইংরুমে ঢুকে ইন্দ্রনাথ সোজা চলে এলেন মাঝামাঝি জায়গায়। এখান থেকে কাঠের সিঁড়ি দোতলার দিকে উঠে গেছে।

সকালে বেড়িয়ে আসার পর কখনও নিচে বসেন না ইন্দ্রনাথ, সরাসরি দোতলার ড্রইংরুমে এসে একটা সোফায় শরীর এলিয়ে দেন। ঘণ্টাখানেক এখানে জিরিয়ে ৴ান পাশে একটা বেডরুমে গিয়ে ভ্রমণের পোশাক পালটে বাথরুমে চলে যান। বারো মাস ন'টার ভেতর স্নানটা চুকিয়ে ফেলা তাঁর বহুকালের অভ্যাস।

অন্য দিনের মতো পুরু গদিওলা সিংহাসন টাইপের নির্দিষ্ট সোফায় এসে বসেন ইন্দ্রনাথ। সেটার পাশে একটা নিচু কাশ্মীরি টেবলে মর্নিং এডিশানের দু'খানা বাংলা আর দু'খানা ইংরেজি কাগজ পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রাখা আছে। আরেকটি টেবলে সবুজ এবং মেরুন রঙের দুটো টেলিফোন।

ড্রইংরুমটার চার দেওয়ালে নাইনটিনথ আর টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির সেরা ক'জন বাঙালির অয়েল পেন্টিং। সেই সঙ্গে রয়েছেন চন্দ্রভূষণ এবং মুখার্জি বংশের অন্যান্য কৃতী পুরুষেরা। তা ছাড়া অনেকগুলো সুদৃশ্য কাচের আলমারি বোঝাই অজস্র বই। সাহিত্য অর্থনীতি ইতিহাস সমাজতত্ত্ব ধর্ম—এমনি নানা বিষয়ের জরুরি গ্রন্থগুলি পুরুষানুক্রমে এখানে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। সরকারি গ্রন্থালয় ছাড়া কলকাতার কোনো পরিবারের লাইব্রেরিতে এত বড় কালেকশান আর নেই।

ইন্দ্রনাথ সবে সোফায় বসেছেন, বংশী প্রায় ছুটতে ছুটতে ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম এবং দু'রকমের নোনতা বিস্কুট সাজিয়ে চলে আসে।

বংশী এ বাড়ির একজন কাজের লোক। মধ্যবয়সী, কালো, রোগাটে। পাতলা মুখ, সরু থুতনি, চুল কাঁচায় পাকায় মেশানো। পরনে খাটো ধুতি আর ফতুয়ার ওপর মোটা চাদর। ইন্দ্রনাথের কখন কী দরকার, সব তার মুখস্থ। তিনি যতক্ষণ বাড়ি থাকেন, ছায়ার মতো সে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে থাকে।

একটা ফাঁকা সাইড টেবল ইন্দ্রনাথের সামনে টেনে এনে ট্রে-টা তার ওপর রাখতে রাখতে বংশী বলে, 'বিলেত থিকে ফোন এসেছেল।' তার বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়। সেই কোন ছেলেবেলায় 'মুখার্জি সদন'-এ চাকরি নিয়ে এসেছিল। খাস উত্তর কলকাতায় জীবন প্রায় কাবার করে এনেছে কিন্তু এই শহর তাকে বিশেষ বদলে দিতে পারেনি। সে হাঁ করলেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অ্যাকসেন্টটি অবিকল বেরিয়ে আসে।

একটু অবাক হয়ে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'সেই ভোরবেলাতেই তো অশোকের ফোন এল। তার সঙ্গে কথা বলে বেড়াতে গেলাম। তুই তো তখন কাছেই ছিলি।'

বংশী জোরে জোরে মাথা নাড়ে। বলে, 'উঁহু, বড়দাদাবাবু লয়, মেজদাদাবাবু।

আপনি বারুবার পর ফোন করলে।'

এবার বেশ চকিত হয়ে ওঠেন ইন্দ্রনাথ। বংশী যার সম্বন্ধে মেজদাদাবাবু বলল সে তাঁর মেজ ছেলে অমিত। সে থাকে টোরোন্টোতে, কানাডার ক্যাপিটালে। বংশীর কাছে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সব বিদেশই হলো বিলেত। সেটা এমন কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। যেটা সবচেয়ে চমকপ্রদ তা হলো অমিতের ফোন করার কথা কাল অর্থাৎ মঙ্গলবার ভোরে। ছ'বছর সে টোরোন্টোতে আছে কিন্তু মঙ্গলবার ছাড়া অন্য কোনো দিন সে ফোন করেনি। এমন অঘটনের কারণটা বোঝা যাচ্ছে না।

বিমূঢ়ের মতো ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'তুই ঠিক শুনেছিস তো?'

বংশী বলে, 'হাঁ বড়বাবু।'

'ভুল হয়নি?'

'না না, ভুল হবে কেন? আমি কি আর অমিত দাদাবাবুর গলা চিনি না? একশ বার চিনি।'

স্থির চোখে বংশীর দিকে তাকান ইন্দ্রনাথ। ভোরবেলায় অশোক ফোন করে জানিয়েছে শুক্রবার সারপ্রাইজ দেবে। তার ওপর এতদিনের নিয়ম বা অভ্যাস ভেঙে অমিত সোমবার ফোন করল। আজকের দিনটা অদ্ভুত চমক দিয়ে যেন শুরু হয়েছে।

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'কী বললে অমিত?'

বংশী বলে, 'খানিক পরে আবার ফোন করবে। আপনারে বাড়ি থাকতে বুলেচে।'

'ঠিক আছে, তুই এখন যা।'

বাংশী চলে যায়।

ইন্দ্রনাথ টি-পট থেকে কাপে দুধ এবং লিকার ঢেলে একটা সুগার কিউব ফেলে দেন। তারপর ধীরে ধীরে চামচ দিয়ে নাড়তে থাকেন। এই বয়সেও ব্লাড সুগার বা প্রেসারের কোনো সমস্যা নেই। চা-টা তিনি নিয়মিত চিনি মিশিয়ে খান। লাঞ্চে মিষ্টি দই এবং ডিনারে একটি জল-ভরা কড়া পাকের সন্দেশ বা দুটি ক্ষীরের পানতুয়া অবশ্যই থাকা চাই।

বেড়িয়ে ফিরে আসার পর এখানে বসে রোজ দু'কাপ চা আর দুটো নোনতা বিস্কুট খান ইন্দ্রনাথ। তার ফাঁকে ফাঁকে চারখানা খবরের কাগজ পড়েন। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। এক হাতে চায়ের কাপ এবং আরেক হাতে একটি খবরের কাগজ তুলে নেন তিনি। হেড লাইনগুলোর দিকে তাকানো মাত্র তাঁর দুই চোখ কুঁচকে যায়।

খবরের কাগজগুলো ক'বছর ধরে পড়ার অযোগ্য হয়ে উঠেছে। সেই খুন,

গণধর্ষণ, হরিজন যুবতীর শ্লীলতাহানি, স্টক এক্সচেঞ্জের স্ক্যাম, প্রতিটি পলিটিক্যাল পার্টিতে বিক্ষুব্ধদের সংখ্যা বৃদ্ধি, কোরাপশান, এম. এল. এ ও এম. পি'দের দলবদল, জনপ্রিয় ফিল্মস্টার বা ক্রিকেটারদের চটচটে কেচ্ছা, তরুণী চিত্রতারকাদের আধন্যাংটো ছবি, জাতপাত নিয়ে দাঙ্গা, কমিউনাল রায়ট, ইত্যাদি। খবরের কাগজের পাতা জুড়ে শুধুই সেক্স, ভয়োলেন্স আর নানা ধরনের স্ক্যান্ডাল। কাল যে সব খবর বেরিয়েছে, আজও তাই। চোখ বুজে বলা যায়, আসছে কালও সেই একই ধরনের সংবাদ বেরুবে। আজকের কাগজ যেন কালকের জেরক্স কপি। দিনের পর দিন খবরের কাগজগুলো একই ধরনের নোংরা যৌনতা আর ভায়োলেন্স সরবরাহ করে চলেছে।

প্রিন্ট মিডিয়া প্রতিদিন ভোরে বাড়ির ভেতর যা পৌঁছে দেয় তা যেমন একঘেয়ে তেমনি ক্লান্তিকর। তবু অভ্যাসবশে পড়ে যান ইন্দ্রনাথ। কেননা পুরো একটি ঘণ্টা কাগজ পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করা আছে। এত কালের অভ্যাস তিনি ভাঙতে চান না।

ইন্দ্রনাথ চা খেতে খেতে খবরের কাগজে ডুবে থাকুন। ন'টা পর্যন্ত তিনি এই ড্রইংরুম থেকে উঠছেন না। তার মধ্যে মুখার্জি বংশ এবং ইন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিশদভাবে জানানো যেতে পারে। তাহলে এই মানুষটিকে বুঝতে সুবিধা হবে।

ইন্দ্রনাথদের বংশের ব্যাকগ্রাউন্ডটা এইরকম। দেড় শ বছর আগে তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ল্যান্ডেড অ্যারিস্টোক্র্যাট। বর্ধমান এবং বীরভূমে তাঁদের দু'আড়াই শ একরেরও বেশি জমিজমা ছিল। জমি থেকে বিস্তর আয় হতো। আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না। ইচ্ছে করলে অঢেল বিলাসে গা ভাসিয়ে ঘোর আলস্যে তাঁরা সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু মুখার্জি বংশের লোকেদের এ ধরনের জীবনাযাপন পদ্ধতি একবোরেই পছন্দ নয়। তাঁরা ছিলেন ভদ্র, উদার, সুশিক্ষিত। সকলেই বাংলা আর সংস্কৃতটা চমৎকার জানতেন, কিছু কিছু ফারসিও। বৃটিশ রাজত্ব কায়েম হয়ে বসলেও ইংরেজি শিক্ষা ব্যাপকভাবে তখনও ছড়িয়ে পড়েনি, কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই ইংরেজিটা আর শেখা হয়ে ওঠেনি। যেখানে যেখানে মুখার্জিদের ল্যান্ড প্রপার্টি ছিল সেই সব অঞ্চলে বহু জনহিতকর কাজ করেছেন ওঁরা। জলকষ্ট যাতে না হয় সেজন্য অগুনতি দীঘি কাটিয়ে দিয়েছেন। গণ্ডা গণ্ডা কবিরাজ এনে দাতব্য চিকিৎসালয় বসিয়েছেন, গরিব ঘরেব ছেলেরা যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে সেজন্য অবৈতনিক পাঠশালা খুলেছেন।

কিন্তু এই বংশেরই একজন চন্দ্রভূষণ অর্থাৎ ইন্দ্রনাথের প্র-ঠাকুরদা ছিলেন দূরদর্শী এবং অক্লান্ত কর্মী। গ্রামে বসেই তিনি বুঝতে পারছিলেন ইংরেজ রাজত্বের পেছনে পেছন যে ওয়েস্টার্ন কালচার, ওয়েস্টার্ন এডুকেশনে এখানে হাজির হয়েছে

তা জীবন সম্পর্কে এদেশের পুরো কনসেপ্ট বা ধ্যানধারণাই বদলে দিচ্ছে। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে বাঙালির কোনো আশা নেই, তাকে কুয়োর ব্যাঙের মতো বদ্ধ জলায় পড়ে থাকতে হবে।

কলকাতা তখন ব্রিটিশ প্রশাসন, শিক্ষা, শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু। চুম্বকের মতো দুরন্ত আকর্ষণে প্রাচ্যের এই নতুন মেট্রোপলিস সারা ভারতবর্ষকে টেনে আনছে। চন্দ্রভূষণও আর গ্রামে বসে থাকতে পারলেন না। তাঁর মনে হয়েছিল, ইংরেজরা আসার পর চারদিকে যে ওলটপালট শুরু হয়েছে সেখানে তাঁরও একটা জরুরি ভূমিকা থাকা উচিত। সেটা তো আর গ্রামে পড়ে থাকলে হয় না।

কলকাতায় এসে চন্দ্রভূষণের প্রথম কাজ হলো ইংরেজি ভাষাটা যত্ন করে শিখে নেওয়া। তিনি ছিলেন খুবই মেধাসম্পন্ন। ভাল মাস্টারমশাই রেখে বিপুল পরিশ্রমে ভাষাটা চমৎকার রপ্ত করে ফেললেন, সাহেবদের কাছে শিখলেন ইংলিশ কনভারসেশনের চোস্ত স্টাইল। সেই সঙ্গে কলকাতার এলিট সোসাইটিতে মেলামেশা শুরু করলেন। একটা ব্যাপার তাঁর কাছে তখন স্পষ্ট হয়ে গেছে। বড় রকমের সামাজিক ভূমিকা পালন করতে হলে এই শহরেই তাঁকে থাকতে হবে। সেজন্য অজস্র টাকা দরকার। বর্ধমান আর বীরভূমের ল্যান্ড থেকে যা আসে তা পর্যাপ্ত নয়। এদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যেও ঝোঁক নেই। কী করবেন যখন ভাবছেন সেই সময় এক বন্ধুর পরামর্শে কলকাতার বড় বড় ব্রিটিশ কোম্পানির শেয়ার কিনতে লাগলেন। বছরের শেষে ডিভিডেন্ড আসতে লাগল স্রোতের মতো। তার একটা মোটা অংশ দিয়ে আবার শেয়ার কিনলেন। এইভাবে বছরের পর বছর চলতে লাগল। দশ বছর পেরুবার আগেই চন্দ্রভূষণ তাঁর পরের জেনারেশনের নিশ্চিন্তে জীবন কাটাবার ব্যবস্থা করে ফেললেন। এরই ভেতর নর্থ ক্যালকাটায় তৈরি করালেন ক্যাসলের মতো এই বাড়ি—'মুখার্জি সদন'।

কলকাতায় তখন একদিকে চলছে উদ্দাম বাবুতন্ত্র। পায়রা উড়িয়ে, লখনৌ কি বেনারস থেকে বাঈজি আনিয়ে তাকে বাগানবাড়িতে প্রতিষ্ঠা করে, চটচটে অশ্লীল খেউড় শুনে, হুইস্কির স্রোতে তলিয়ে যাচ্ছে এখানকার নিও-রিচ বা নতুন পয়সাওলা বড় মানুষেরা। তাদের দিকে তাকালে মনে হয় এখানে ডিকাডেন্স বা অধঃপতন ছাড়া আর কিছুই নেই।

কিন্তু এরই পাশাপাশি সমান্তরাল ধারায় চলেছে বেঙ্গল রেনেসাঁস। শিল্প, সাহিত্য, নাটক, পেইন্টিং, ব্যবসা-বাণিজ্য, যেখানেই বাঙালি হাত রাখছে সেখানেই সোনা ফলছে। সেই সঙ্গে চলছে সোসাল রিফর্ম বা সমাজ-সংস্কারের কাজ। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, বিধবা-বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে সমস্ত দেশ জুড়ে তখন ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

বিদ্যাসাগরের অনুগামী চন্দ্রভূষণ শেষের দুটি দিককে নিজের কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। শিক্ষাকে বাঙালির অন্তঃপুরে পৌঁছে দেবার জন্য কলকাতায় মেয়েদের স্কুল বসিয়েছেন, নিজে দাঁড়িয়ে প্রচুর খরচ করে তরুণী বিধবাদের বিয়ে দিয়েছেন। এর জন্য তাঁকে বার বার লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। তাঁকে আক্রমণ করে বিদ্যাসাগরের মতো কুৎসিত সব ছড়া বেঁধে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় গাওয়া হতো। শুধু তাই নয়, স্ট্যাটাসকো বা স্থিতাবস্থায় যারা বিশ্বাসী, পুরনো কুসংস্কার যারা আবহমানকাল ধরে যখের মতো আগলে বসে আছে তারা লোক লাগিয়ে দু-তিন বার তাঁর মাথাও ফাটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু চন্দ্রভূষণকে ঠেকানো যায়নি। ভয়লেশহীন আইডিয়ালিস্ট মানুষটির জেদ এর ফলে কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছিল যেন। প্রবল নিষ্ঠায় তিনি নিজের কাজ করে গেছেন।

গোঁড়া প্রাচীনপন্থীরা কবে পৃথিবী থেকে মুছে গেছে কিন্তু চন্দ্রভূষণের ইমেজ আজও উজ্জ্বল। তাঁকে বাদ দিলে বেঙ্গল রেনেসাঁস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাঁর জন্য বাঙালির ইতিহাসে মুখার্জি বংশ স্মরণীয় হয়ে আছে। স্বাধীনতার পর চন্দ্রভূষণের নামে 'মুখার্জি সদন'-এর সামনের রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছে। দেশের মানুষ এইভাবেই তাঁকে সম্মান জানাতে চেয়েছে।

চন্দ্রভূষণের ছেলে মণিভূষণ কিন্তু বাবার মতো সোসাল রিফর্ম নিয়ে মাথা ঘামাননি। তিনি সরাসরি চলে এসেছিলেন রাজনীতিতে। তাঁর যৌবনে সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে স্বদেশ প্রেমের উন্মাদনা চলছিল। একদিকে স্বায়ত্তশাসনের কথা ভাবা হচ্ছে, অন্য দিকে ইংরজে রাজত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের জন্য বিপ্লবীরা তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন। এই সময় লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের ষড়যন্ত্র করলেন। ক্ষোভে ক্রোধে উত্তেজনায় সমস্ত দেশ জুড়ে যেন বিস্ফোরণ ঘটে গেল। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সব বাঙালির তখন একই প্রতিজ্ঞা, যেভাবে হোক বঙ্গভঙ্গ বন্ধ করতেই হবে। এই আন্দোলেন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মণিভূষণ। শুধু তাই না, নানাভাবে এর নেতৃত্বও দিয়েছেন। তাঁর আমলে তিলক, মোতিলাল, রবীন্দ্রনাথ, ডব্লু সি ব্যানার্জি থেকে কে আসননি 'মুখার্জি সদন'-এ! বাঙালি জাতির জীবনে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গেছেন মণিভূষণ।

তাঁর ছেলে প্রীতিভূষণ অর্থাৎ ইন্দ্রনাথের বাবা এক জেনারেশন আগের চন্দ্রভূষণের মতো সমাজসংস্কারক ছিলেন না। রাজনীতি সম্পর্কেও তাঁর খুব একটা আগ্রহ ছিল না। তিনি ছিলেন আদ্যোপান্ত এডুকেশানিস্ট। সারা ছাত্রজীবন চোখ-ধাঁধানো রেজাল্ট করার পর অধ্যাপক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন। তারপর একটানা পঁয়ত্রিশ বছর তাঁর হাত দিয়ে অসামান্য সব ছাত্র বেরিয়েছে, দেশগঠনের

কাজে যাদের ভূমিকা ছিল বিরাট। এইভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে গেছেন তিনি।

প্রীতিভূষণের ছেলেই ইন্দ্রনাথ। বাবার মতো তিনিও শিক্ষাবিদ, ছাত্র হিসেবে ছিলেন তেমনি ব্রিলিয়ান্ট। মাত্র তিরিশ বছর বয়সে নাম-করা এক কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হন। প্রীতিভূষণের মতো তিনিও মনে করতেন সুশিক্ষিত মানুষ ছাড়া কোনো দেশ বড় হয় না। মানুষ গড়ার নিপুণ কারিগর ইন্দ্রনাথের অজস্র ছাত্র ছড়িয়ে আছে ভারতবর্ষে তো বটেই, পৃথিবীরও নানা প্রান্তে। এদের কেউ অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের বিখ্যাত বিজ্ঞানী, কেউ আছে প্ল্যানিং কমিশনে, কেউ ডিফেন্স মিনিস্ট্রির বড় অফিসার, কেউ আই এ এস, কেউ আছে ফরেন সার্ভিসে, কেউ বা নাম-করা জার্নালিস্ট। দেশকে বছরের পর বছর এই সব মূল্যবান উপহার দিয়ে গেছেন তিনি।

পাঁচ বছর আগে রিটায়ার করেছেন ইন্দ্রনাথ। তাঁর বিষয় ছিল ইতিহাস। কলেজে থাকতে থাকতেই রেনেসাঁসের সময় থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত কয়েক খণ্ডে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস লিখেছেন। ছাত্রপাঠ্য টেক্সট বুক নয়, গবেষণামূলক এই বিপুল গ্রন্থটি পড়তে পড়তে প্রায় পৌনে দু'শ বছরের বাঙালি জীবনের নিখুঁত একটি চিত্র চোখের সামনে ফুটে ওঠে। বইটি দেশবিদেশের [illegible] গুণীদের সম্ভ্রম আদায় করে নিতে পেরেছে।

অনেক আগেই ইন্দ্রনাথ স্থির করেছিলেন, রিটায়ারমেন্টের পর তাঁর গ্রন্থটির শেষ পর্ব লিখবেন। স্বাধীনতা এবং দেশভাগের পর প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বাঙালির জীবনে যে অধঃপতন শুরু হয়েছে, অন্তিম পর্বে থাকবে সেই ইতিহাস। চার বছর এর জন্য তিনি অজস্র তথ্য জোগাড় করেছেন। লেখার কাজ শুরু হয়েছে বছরখানেক, শেষ হতে আরো দু বছর লাগবে।

লেখালিখি, গবেষণা, দেশের মানুষ সম্পর্কে ভাবনা, এসব তাঁর জীবনের একটা দিক। অন্য দিকে রয়েছে তাঁর ছেলেমেয়েরা এবং স্ত্রী। ইন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবন অন্য পাঁচজন বাঙালির থেকে বেশ আলাদা। তাঁর তিন ছেলে, দুই মেয়ে। সবাই অসাধারণ কৃতী। বড় ছেলে অশোকের কথা আগেই বলা হয়েছে, সে নিউ ইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের বিরাট অফিসার, স্ত্রী এবং এক ছেলে, এক মেয়েকে নিয়ে আট বছর সেখানে আছে। ওরা আমেরিকান ন্যাশানালিটি পেয়ে গেছে। মেজ ছেলে টোরোন্টোয় এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাপ্লায়েড ফিজিকসের অধ্যাপক, তার স্ত্রী মাধবী ওখানেই ইকনমিকস পড়ায়। ওদের এক মেয়ে। কানাডার ন্যাশানালিটি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে, এখনও পায়নি, তবে খুব তাড়াতাড়িই পেয়ে যাবার সম্ভাবনা। ছোট ছেলে অরুণ আছে লন্ডনে, একটা মাল্টি-ন্যাশানাল ইংলিশ ফার্মের সে ডেপুটি

ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার। মাসখানেক হলো ওরা ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেয়ে গেছে। ওর স্ত্রী ইন্ডিয়ান এমব্যাসিতে ভাল চাকরি করে। বড় মেয়ে অঞ্জনা এবং তার স্বামী শুভময় থাকে সিডনিতে, দু'জনেই ওখানকার বিশ্বদ্যিালয়ে অ্যানথ্রোপলজি পড়ায়। ওদের একমাত্র মেয়ে রিখি স্কুল ছেড়ে সবে কলেজে ঢুকেছে। ইন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে বিপাশা তার বড়দা অশোকের কাছে নিউ ইয়র্কে থাকে। পিওর ম্যাথমেটিকসে ডিগ্রি নেবার পর কম্পিউটার নিয়ে কী সব কোর্স কমপ্লিট করে এখন সে ওখানকার স্টক এক্সচেঞ্জে একজন টপ একজিকিউটিভ। এশিয়ান মেয়েদের মধ্যে সে-ই প্রথম এরকম একটা প্রাইজ পোস্ট পেল। তার এখনও বিয়ে হয়নি। এদের ডাক-নাম বয়স অনুযায়ী বড় খোকা, মেজ খোকা, ছোট খোকা, বড় খুকি এবং ছোট খুকি।

ইন্দ্রনাথের স্ত্রী সুপ্রভা দু'বছরের ওপর কলকাতায় নেই। পৃথিবীর চার প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ছেলেমেয়েদের কাছে অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কলকাতার বিশাল 'মুখার্জি সদন'-এ একা পড়ে আছেন ইন্দ্রনাথ। ছেলেমেয়েরা অবশ্য তাঁকে নিজেদের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছে, অন্তত কিছুদিন বেড়িয়ে আসার জন্য বারবার চাপ দিয়েছে কিন্তু কলকাতা ছেড়ে কোথাও যেতে তাঁর ইচ্ছা করে না।

নিজের ছেলেমেয়েদের ঠিক বুঝতে পারেন না ইন্দ্রনাথ। দেশে থাকতেও তারা বিরাট বিরাট চাকরি করত। তা ছাড়া পুরুষানুক্রমে ব্যাঙ্কে অজস্র টাকা জমা রয়েছে। আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো অভাব নেই। কিন্তু তাতে তারা সন্তুষ্ট নয়। ওরা সবাই প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ভারতবর্ষের ম্যাড়মেড়ে ঢিলেঢালা জীবন তাদের একেবারেই পছন্দ নয়। সুযোগ পাওয়া মাত্র তারা একে একে বিদেশে চলে গেছে। সপ্তাহের এক একদিন এক একজন আড়াই মিনিট করে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলে। সোমবার অশোক, মঙ্গলবার অমিত, বুধবার অরুণ, বৃহস্পতিবার অঞ্জনা, শুক্রবার বিপাশা। শনিবার বাদ, রবিবার সুপ্রভা যখন যেখানে থাকেন সেখান থেকে ফোন করেন।

ছেলেমেয়েরা প্রতিদিন মাত্র আড়াই মিনিট ইন্দ্রনাথের জন্য ব্যয় করে থাকে। প্রতি সপ্তাহে, বছরের পর বছর একই কথা তারা বলে আসছে। ভীষণ ক্লান্তিকর এবং একঘেয়ে। কার কেরিয়ারের গ্রাফ কোথায় কতটা পৌঁছেছে, কে ক'টা নতুন মডেলের গাড়ি, র‍্যাঞ্চ বা বাংলো কিনেছে, ইত্যাদি। শুনতে শুনতে আজকাল আর কোনোরকম প্রতিক্রিয়া হয় না ইন্দ্রনাথের। মনে হয়, আধ-চেনা ক'টি কেরিয়ারিস্টের সঙ্গে কথা বলছেন।

চার জেনারেশন ধরে মুখার্জি বংশের যে গৌরবময় ট্রাডিশান, ওদের কাছে তা একেবারেই অর্থহীন। এই দেশ, তার মানুষ, তার সোসাইটি—এসব নিয়ে তারা আদৌ মাথা ঘামায় না। ভারতবর্ষ, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ তাদের কাছে বাসের

অযোগ্য। এখান থেকে শিকড় উপড়ে নিয়ে তারা চলে গেছে নানা মহাদেশে।

ছেলেমেয়েরা তাঁর সঙ্গে কথা বলে ঠিকই কিন্তু কোনোরকম কমিউনিকেশান নেই। ওদের মুখগুলো ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে যেন। শুধু কি ছেলেমেয়েরাই, নিজের স্ত্রী সুপ্রভাকেও আজকাল অচেনা মনে হয়। প্রতি সপ্তাহে আড়াই মিনিট তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক নেই। ছেলেমেয়েদের মতো ইওরোপ-আমেরিকা তাঁকেও বুঝিবা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

খবরের কাগজের পাতায় কতক্ষণ মগ্ন হয়ে ছিলেন, খেয়াল নেই ইন্দ্রনাথের। হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে। চমকে রিসিভারটা তুলে কানে লাগাতেই কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে অমিতের গলা ভেসে আসে। সে বলে, 'বাবা, আমি মেজ খোকা বলছি। সকালে একবার ফোন করেছিলাম।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'হ্যাঁ, বংশী বলেছে। কিন্তু তোর তো কাল ফোন করার কথা।'

'হ্যাঁ। একটা ভীষণ আর্জেন্ট ব্যাপারে আজই করতে হলো। নিউ ইয়র্ক থেকে দাদা তোমাকে কিছু বলে নি?'

'বলেছে। কিন্তু আর্জেন্ট ব্যাপারটা কী, তা জানায় নি।'

'আমিও এক্ষুনি জানাচ্ছি না। শুক্রবার তুমি বাড়ি থাকছ তো?'

'থাকছি। কোথায় আর যাব?'

'শুক্রবারই জানতে পারবে।'

দুই ছেলেই তাঁর কৌতূহলকে উসকে দিয়েছে কিন্তু আসল কথাটা ঘুণাক্ষরেও জানালো না। এই রহস্যময়তার কারণ কী? মনে মনে বেশ বিরক্তই হলেন ইন্দ্রনাথ। এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন অবশ্য করলেন না। শুধু বললেন, 'তোর মা এখন কোথায়?'

অমিত বলে, 'পরশু দুপুর পর্যন্ত আমাদের এখানে ছিল। বিকেলের ফ্লাইটে সিডনিতে দিদির কাছে গেছে।'

টোরোন্টো থেকে সিডনি অর্থাৎ কানাডা থেকে অস্ট্রেলিয়া কত হাজার কিলোমিটার দূরে, আবছাভাবে একবার ভাবতে চেষ্টা করলেন ইন্দ্রনাথ। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে।'

এবার পুরনো রেকর্ড বাজানোর মতো অমিত বলে, 'শরীরের যত্ন নিও। ঠিক সময়ে খাওয়া দাওয়া করো। কোনোরকম অনিয়ম করবে না।'

যান্ত্রিক আবেগহীন সুরে এতকাল সব ছেলেমেয়েকে ইন্দ্রনাথ যা বলে এসেছেন, অমিতকেও তাই বললেন, 'ঠিক আছে।'

আড়াই মিনিটের কথোপকথন শেষ হলে ইন্দ্রনাথ যখন ফোনটা নামিয়ে রাখছেন, ড্রইংরুমের ডান দিক থেকে গ্র্যান্ডফাদার ক্লকটা সুরেলা আওয়াজ করে

জানান দিল ন'টা বেজেছে।

আস্তে আস্তে উঠে পড়েন ইন্দ্রনাথ। তারপর সোজা কোণের দিকের বেডরুমে এসে অ্যাটাচড বাথ-এ চলে যান।

তিন

শেভ করে স্নানটান সারতে সারতে দশটা বেজে যায়। বাড়ির পোশাক ঢোলা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে তার ওপর দামি শাল জড়িয়ে তেতলায় উঠে যান ইন্দ্রনাথ।

একতলা এবং দোতলার মতো তেতলাতেও বিশাল ড্রইংরুম, তবে সেটাকে বসার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয় না। ওটা আসলে ইন্দ্রনাথের লাইব্রেরি। চারদিকে কাচের আলমারি আর নানা আকারের র‍্যাকে অজস্র বই, জার্নাল।

ড্রইংরুমটার বাঁ দিকে এবং ডান ধার ঘেঁষে ক'টা শোওয়ার ঘর। সবাই যখন কলকাতায় থাকত তখন দক্ষিণ দিকের ঘরটায় তিনি এবং সুপ্রভা থাকতেন। দোতলায় থাকত ছেলেমেয়েরা। এখন একাই তিনি এই তেতলায় রাত কাটান। হল-ঘরে রয়েছে মেহগনি কাঠের বিশাল টেবল, তার দু'পাশে নানা'রকম রেফারেন্স বইয়ের পাহাড়। তা ছাড়া পিন-কুশন, স্টেপলার, লেখার কাগজ, পেনস্ট্যান্ড ইত্যাদি। ওখানে বসেই লেখাপড়ার কাজ করেন ইন্দ্রনাথ। টেবলটার বাঁ দিকে রয়েছে পুরু গদিওলা একটা ডিভান। লিখতে লিখতে বা পড়তে পড়তে ক্লান্তিবোধ করলে ডিভানটায় শরীর এলিয়ে দেন। একটা পর্যন্ত লেখালিখির পর একতলার ডাইনিং রুমে গিয়ে লাঞ্চ খেয়ে লাইব্রেরিতে ফিরে আসেন ইন্দ্রনাথ। তিনটে পর্যন্ত বিশ্রামের পর আবার লেখার কাজ শুরু হয়। চলে সাড়ে পাঁচটা-ছ'টা পর্যন্ত। এই সময় দু-চার জন রিসার্চ স্কলার তাদের গবেষণার ব্যাপারে তাঁর গাইডেন্সের জন্য আসে। মাঝে মাঝে আসেন তাঁর বইয়ের প্রকাশক কিংবা কলেজের প্রাক্তন সহকর্মীরা। এঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সাতটা বেজে যায়। তারপর ঘণ্টা দুই শুধুই পড়া। কাঁটায় কাঁটায় ন'টায় নিচে নেমে ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়েন। মোটামুটি এই হলো তাঁর প্রতিদিনের রুটিন। রবিবারটা লেখাপড়ার কাজ বন্ধ। সেদিন মালীকে সঙ্গে নিয়ে সকাল-বিকেল নিচের বাগানে আর ছাদের রুফ-গার্ডেনে কাটিয়ে দেন। গাছের যত্ন করাটা তাঁর চিরদিনের প্যাসান।

আজ স্নানটানের পর লাইব্রেরিতে এসে যথারীতি সোজা পড়ার টেবলে গিয়ে বসেন ইন্দ্রনাথ। এখানেও একটা টেলিফোন আছে। লেখা শুরু করতে যাবেন, সেই

সময় বংশী একটা বড় প্লেটে ধবধবে ছ'খানা লুচি, বেগুনভাজা, আলুর তরকারি, একটা কলা এবং শশা নিয়ে আসে। লেখার টেবলে বসে ব্রেকফাস্ট করাটা তাঁর ছেলেবেলার অভ্যাস।

লাইব্রেরির গা ঘেঁষে টয়লেট। দ্রুত খাওয়া সেরে হাত ধুয়ে টেবলে ফিরে এসে লেখা শুরু করেন ইন্দ্রনাথ।

দু-এক পাতা লিখতে না লিখতেই ফোন বেজে ওঠে। মাঝে মাঝে এই সকালের দিকটায় পুরনো ছাত্র বা বন্ধুরা ফোন করেন। ইন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল তাঁদের কেউ হবেন। ফোন তুলে হ্যালো বলতেই ওধার থেকে যাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে তাঁর কথা এই মুহূর্তে ভাবেননি তিনি। একটু চকিত হয়েই বলেন, 'কী ব্যাপার সুপ্রভা, তোমার তো রবিবার ফোন করার কথা!'

সুপ্রভা বলেন, 'একটা দরকারে আজই করতে হলো। তুমি কি জানো, আমি সিডনিতে বড় খুকিদের কাছে এসেছি?'

'জানি। কিছুক্ষণ আগে মেজ খোকা টোরোন্টো থেকে ফোন করে বলেছে।'

'শুক্রবারের কথা কিছু জানিয়েছে?'

'হ্যাঁ। বলেছে বাড়ি থেকে যেন না বেরোই। নিউ ইয়র্ক থেকে ভোরে বড় খোকাও ফোন করে একই কথা বলেছে।'

'যাক, দুই ছেলের ফোন তাহলে পেয়ে গেছ।' বেশ নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতেই কথাগুলো বললেন সুপ্রভা।

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'তা পেয়েছি। কিন্তু শুক্রবার কেন আমাকে বাড়িতে আটকে থাকতে হবে সেটা কিছুতেই বলল না। তুমি কিছু জানো?'

উত্তরটা পুরোপুরি এড়িয়ে গেলেন সুপ্রভা। রগড়ের গলায় বললেন, 'মাঝখানে মোটে তিনটে দিন, তারপরই সব জানতে পারবে। তুমি তো মুনি-ঋষিদের মতো নির্বিকার মানুষ, কৌতূহলটা এ ক'দিন নিশ্চয়ই চেপে রাখতে পারবে। এখন রহস্য ফাঁস করে দিলে শুক্রবারের মজাটা তেমন জমবে না।'

ইন্দ্রনাথ চুপ করে থাকেন।

সুপ্রভা এবার বলেন, 'এর মধ্যে দেবকুমার মজুমদার বলে কেউ তোমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন?'

ইন্দ্রনাথ বেশ অবাক হয়ে যান। বলেন, 'না তো। তিনি কে?'

'একজন বিশিষ্ট ভারতীয় নাগরিক। সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন, কয়েক বছর আগে রিটায়ার করেছেন।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করবেন কেন?'

'দরকার আছে।'

'কী দরকার?'

'আশা করি খুব শিগগিরই তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে। তখনই সব জানতে পারবে।'

'কী আশ্চর্য, চেনা নেই জানা নেই এমন একজন আমার কাছে আসবেন কেন? একটা কারণ তো থাকবে।'

'বললামই তো দরকার আছে। অকারণে কেউ কারো কাছে যায় নাকি?'

এবার রীতিমেতো ঝাঁঝালো গলায় ইন্দ্রনাথ বলেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার, এত হেঁয়ালি করার কী আছে?'

সুপ্রভার হাসির শব্দ ভেসে আসে। তিনি হালকা গলায় বলেন, 'অত রাগারাগি করো না। দেবকুমারবাবু নিজে এসে সব বলবেন। আচ্ছা, ছেড়ে দিচ্ছি।' ইন্দ্রনাথকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আচমকা লাইন কেটে দেন সুপ্রভা।

তারপরও অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন ইন্দ্রনাথ। আজ ভোর থেকে দুই ছেলে আর তাদের জননী তাঁকে যেন নাচিয়ে চলেছেন।

বিক্ষিপ্ত মনটা গুছিয়ে নিয়ে একসময় ফের লিখতে শুরু করেন ইন্দ্রনাথ।

চার

এরপর তিনটে দিন রুটিন অনুযায়ী কেটে যায়। লন্ডন থেকে ছোট ছেলে অরুণ ছাড়া অন্য ছেলেমেয়েরা বা সুপ্রভা এর মধ্যে আর ফোন করেননি। অরুণও তার মা এবং দাদাদের মতো শুক্রবারে ইন্দ্রনাথের বাড়িতে থাকার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে। কেন থাকবেন, তার সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

সুপ্রভা যে দেবকুমারবাবুর কথা বলেছিলেন, তিনিও দেখা করতে আসেননি। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা ইন্দ্রনাথের কাছে রহস্যময় এবং জটিল হয়ে উঠেছে। নিজেকে অবশ্য আগ্রহশূন্য রাখতে চেষ্টা করেছেন তিনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর সম্ভব হয়নি। অজান্তেই ভেতরে ভেতরে কখন যে টেনসান শুরু হয়ে গিয়েছিল, টের পাওয়া যায়নি।

স্ত্রী আর ছেলেদের ফোন আসার পর ভোরের ভ্রমণসঙ্গীদের ইন্দ্রনাথ জানিয়ে দিয়েছেন, শুক্রবার ময়দানে যাবেন না। অন্যেরা যে যাই করুন, তিনি যে এতকালের

অভ্যাস এবং নিয়ম ভঙ্গ করবেন তা যেন কেউ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বন্ধুরা বারবার জানতে চেয়েছেন কেন সেদিন তিনি বাড়ি থেকে বেরুবেন না? তার সঠিক উত্তর ইন্দ্রনাথের জানা নেই। তিনি শুধু বলছেন, 'খুব জরুরি কাজ আছে।'

'কী কাজ?'

'পরে তোমাদের জানাব।'

শুক্রবার যথারীতি ভোরে সাড়ে চারটের মধ্যেই ঘুম ভেঙে গেছে ইন্দ্রনাথের। মুখ টুখ ধুয়ে গরম পোশাক পরে সোজা উঠে গেছেন ছাদে।

দীর্ঘকালের বেড়ানোর অভ্যাসটা যাবে কোথায়? আট হাজার স্কোয়ার ফিটের বিশাল ছাদের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত তিনি লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটতে থাকেন।

এখনও রোদ ওঠেনি, যেদিকে যতদূর চোখ যায় সব কুয়াশায় ঢাকা। পাঁচ-সাতটা বাড়ির পর সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ। ওখান দিয়ে ক্বচিৎ দু-একটা গাড়ি কুয়াশার দেওয়াল ফুঁড়ে ফুঁড়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। লোকজন চোখেই পড়ে না।

ছাদময় হাঁটাহাঁটি কবতে করতে টেনসানটা যেন আজ অনেক বেড়ে গেছে।

একসময় প্রকাণ্ড লাল বলের মতো সূর্যটা পুব দিকের ঘন চাপ-বাঁধা পুরনো আমলের বাড়িগুলোর ওধার থেকে লাফ দিয়ে উঠে আসে। নর্থ ক্যালকাটার এই এলাকাটা বিশেষ বদলায়নি, দু-চারটে নতুন স্কাইস্ক্রেপার বাদ দিলে পঞ্চাশ, ষাট কি একশ বছর আগে যেমন ছিল প্রায় সেরকমই আছে। এখানকার রাস্তাঘাট, বাড়ির ডিজাইন, মন্দির, দোকানপাট—সব কিছুতেই প্রাচীনত্বের গন্ধ মাখা। অলৌকিক কোনো ক্ষমতায় জায়গাটা যেন তার আদিকালের চেহারাটা বজায় রেখেছে।

কলকাতার এই অঞ্চলটায় জনসংখ্যার চাপ বোধ হয় সবচেয়ে বেশি। এক স্কোয়ার কিলোমিটারে দেড়-দু লাখের মতো মানুষ থাকে। এর মধ্যে প্রচুর লোকজন বেরিয়ে পড়েছে, সব দিকেই থিকথিকে ভিড়। গাড়ি-টাড়িও অজস্র চোখে পড়ছে। হৈচৈ এবং ব্যস্ততায় চারপাশ সরগরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

পুলওভারের হাতা সরিয়ে ঘড়ি দেখলেন ইন্দ্রনাথ। ছটা বেজে পঞ্চাশ। তার মানে অন্য দিনের তুলনায় কুড়ি মিনিট বেশি হাঁটা হয়েছে। এটাও নিয়মের বাইরে। ভেতরে ভেতরে যে মানসিক চাপটা চলছে, সেজন্য সময় সম্পর্কে খেয়াল ছিল না। তাড়াতাড়ি নিচে নামতে যাবেন, হঠাৎ ধাতব আওয়াজে সামনের রাস্তার দিকে তাকান ইন্দ্রনাথ। তখনই চোখে পড়ে দারোয়ান ধানোয়ার সিং গেট খুলে দিয়েছে আর দুটো ট্যাক্সি বাড়ির কমপাউন্ডে ঢুকে বাগানের পাশ দিয়ে একতলার বাইরের

দিকের চওড়া চওড়া শ্বেত পাথরের সিঁড়িগুলোর কাছে চলে এসেছে।

রীতিমতো অবাকই হন ইন্দ্রনাথ। এই সকালবেলায় কারা আসতে পারে? তিনি ছাদের যে অংশটায় দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে কোনাকুনি ট্যাক্সি দুটো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তীব্র কৌতূহলে কার্নিসের কাছে এসে অনেকটা ঝুঁকে নিচের দিকে তাকালেন ইন্দ্রনাথ।

ট্যাক্সির দরজা খুলে হৈহৈ করতে করতে নেমে এল অশোক, তার স্ত্রী মল্লিকা, ছেলে রণি, মেয়ে বনি, বিপাশা, অমিত, তার স্ত্রী মাধবী, ওদের মেয়ে ডোনা, অরুণ এবং তার স্ত্রী বিনিতা। দারোয়ান ধানোয়ার সিং, মালী নটবর আর রাঁধুনী হরেন, আর দুই ড্রাইভার ট্যাক্সির ক্যারিয়ার থেকে ঢাউস ঢাউস সব সুটকেশ, নানা চেহারার ব্যাগ, ওয়াটার বটল, ফ্লাস্ক, হট কেস ইত্যাদি নামিয়ে বাড়ির ভেতর নিয়ে আসতে লাগল।

বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ইন্দ্রনাথ। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল ছেলেরা সারপ্রাইজ দেবার কথা বলেছিল। সত্যিই সেটা দিতে পেরেছে। ওরা যে আগে থেকে কিছু না জানিয়ে এভাবে আচমকা চলে আসবে, তা ছিল একেবারেই অভাবনীয়। কত কাল পর নিজের ছেলেমেয়েদের দেখলেন ইন্দ্রনাথ? ঠিক মনে পড়ল না। তবে বুকের ভেতরটা এই বয়সেও আশ্চর্য এক আবেগে তোলপাড় হয়ে যেতে লাগল।

চমকটা থিতিয়ে এলে ইন্দ্রনাথ যখন ছাদ থেকে দ্রুত নামতে শুরু করেছেন, বংশী একসঙ্গে দু-তিনটে করে সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে ওপরে উঠে আসতে লাগল। দারুণ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তাকে। কাছাকাছি এসে বলল, 'বড়বাবু, বড়দাদাবাবু, মেজদাদাবাবু, ছোটদাদাবাবু, বৌদিদিরা, ছোটদিদি—সবাই বিলেত থেকে চলে এয়েচে।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'ছাদ থেকে দেখেছি। চল—'

গ্রাউন্ড ফ্লোরে আর যেতে হলো না। দোতলার হল-ঘরে নামতেই দেখা গেল অশোকরা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছে। তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন।

কলকাতা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে নানা কন্টিনেন্টের দূষণমুক্ত আবহাওয়ায় থেকে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য অনেক ভাল হয়ে গেছে। তা ছাড়া অঢেল আরাম, সাফল্য আর অজস্র টাকা তাদের চেহারায় এনে দিয়েছে বাড়তি একটা পালিশ।

অশোকের ছেলে রণির বয়স এখন ষোল। মেয়ে বনির উনিশ। অমিতের ছেলে নেই, মেয়ের নাম ডোনা। তার বয়স বারো-তেরো। অরুণের ছেলেমেয়ে নেই। প্রায়

আট বছর বাদে নাতিনাতনিদের দেখলেন ইন্দ্রনাথ। তবে চিনতে অসুবিধা হলো না, কেননা প্রতি বছরই অশোক, অমিত, অরুণ আর অঞ্জনা পয়লা জানুয়ারি তাদের পারিবারিক গ্রুপ ফটো বাবাকে পাঠায়। সেই সঙ্গে নিউ ইয়র্ক থেকে বিপাশার ছবিও আসে। রোজ সকালে আড়াই মিনিট করে ফোন করা আর ফোটো পাঠানো ছাড়া সম্পর্ক বজায় রাখার উপায় নেই।

ছেলেমেয়ে, পুত্রবধূ আর নাতিনাতনিদের এতকাল পর দেখে খুব ভাল লাগছিল ইন্দ্রনাথের। তাঁর মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে ওঠে।

এক একে সবাই এসে তাঁকে প্রণাম করতে থাকে। ইন্দ্রনাথ বলেন, 'হয়েছে, হয়েছে। বসো—'

দোতলার হল-ঘরেই তাঁকে ঘিরে সকলে বসে পড়ে। ইন্দ্রনাথ শুনেছেন ছোট মেয়ে বিপাশা এবং ছেলের বৌরা বিদেশে নাকি জিনস-টিনস পরে। কিন্তু এখন তাদের পরনে শাড়ি এবং কনুই পর্যন্ত হাতওলা ব্লাউজ। ইন্দ্রনাথ শার্ট ট্রাউজার পরলেও মনে প্রাণে ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা বাঙালি। তিনি যাতে বিরক্ত বা ক্ষুব্ধ না হন সেজন্য আদ্যোপান্ত বাঙালি সাজেই তারা দেশে ফিরেছে। এতে খুশিই হলেন তিনি। দেখা যাচ্ছে ওরা তাঁর পছন্দ-অপছন্দ, ভালো-লাগা, মন্দ-লাগার ব্যাপার গুলো মাথায় রেখেছে। অবশ্য নাতিনাতনিরা জিনস-টিনস পরেই এসেছে। সেটা মোটমুটি মেনেই নিলেন ইন্দ্রনাথ। আজকাল কলকাতাতেই নতুন জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা এই পোশাকেই ঘুরে বেড়ায় আর ওরা তো সেই ছেলেবেলা থেকেই ইওরোপ-আমেরিকায় কাটাচ্ছে।

অশোক বলে, 'বাবা, তোমাকে খুব অবাক করে দিয়েছি, তাই না?'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'তা দিয়েছিস। তোরা যে দল বেঁধে চলে আসবি, ভাবতে পারিনি।' একটু থেমে বলেন, 'একটা ব্যাপার পরিষ্কার হচ্ছে না।'

অশোক জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'তোরা কেউ থাকিস লন্ডনে, কেউ নিউ ইয়র্কে, কেউ টোরোন্টোয়। একসঙ্গে কলকাতায় এলি কী করে?'

অশোকের স্ত্রী মল্লিকা জানায়, তারা ফোন করে ঠিক করেছিল কাল এক এক জায়গা থেকে নানা এয়ারলাইনসের প্লেনে দিল্লিতে এসে পৌছবে, সেখানে থেকে ডোমেস্টিক ফ্লাইট ধরে কলকাতায় আসবে।

ইন্দ্রনাথ একটু হাসেন। বলেন, 'ও, আচ্ছা।—কিন্তু—'

মেজ ছেলে অমিত এবার বলে ওঠে, 'তুমি নিশ্চয়ই বলবে, এত ভোরে দিল্লির কোনো ফ্লাইট তো কলকাতায় আসে না।'

'হ্যাঁ—' আস্তে মাথা নাড়েন ইন্দ্রনাথ।

'আমরা কাল ইভনিং ফ্লাইটের টিকিট কেটেছিলাম, কিন্তু প্লেন ছাড়তে পাঁচ ঘণ্টা লেট করল। মাঝরাতে কলকাতায় পৌঁছে বাড়ি আসতে সাহস হলো না। শুনেছি সিটিতে আসার রাস্তা নাকি রাতে খুব সেফ নয়। তাই এয়ারপোর্ট হোটেলে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে সকাল হতেই ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলাম।'

'এতক্ষণে বোঝা গেল।'

এই সময় ছোট ছেলে অরুণ বলে, 'বাবা সিডনি থেকে মা কি এর ভেতর তোমাকে ফোন করেছে?'

'হ্যাঁ, করেছে। দাঁড়া, আগে তোদের থাকার আর ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করি।' বলে বংশী হরেন নরহরি আর ভোলাকে ডাকলেন ইন্দ্রনাথ।

বংশীর মতো হরেন নরহরি আর ভোলাও এবাড়ির কাজের লোক। ভোলা ইন্দ্রনাথের নানারকম ফাইফরমাশ খাটে, তা ছাড়া তাঁর প্রিয় অ্যামবাসাডর গাড়িটাও চালায়। হরেন রাঁধুনী, রান্নাঘরের দায়িত্ব তার। অশোকদের মালপত্র খানিক আগে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে এনে দোতলার এই হল-ঘরের একধারে জড়ো করে রেখে তারা অপেক্ষা করছিল। ওরা কাছে এলে ইন্দ্রনাথ হলের চারদিকের বেডরুমগুলো দেখিয়ে নরহরি আর বংশীকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে ঘরগুলো আগে পরিষ্কার করে দে। বেড-কভার আর বালিশের ওয়াড় পালটে দিবি।' হরেনকে বলেন,' ভাল করে ময়ান দিয়ে লুচি ভাজ। সেই সঙ্গে ফুলকপির তরকারি করবি, আলু-বেগুন ভাজবি।' পকেট থেকে মানি-ব্যাগ বার করে ভোলাকে টাকা দিতে দিতে বলেন, 'জল-ভরা নলেন গুড়ের তালশাঁস সন্দেশ আর ক্ষীরের পানতুয়া নিয়ে আয়। চটপট চলে আসবি। তুই এলে আমি তোকে নিয়ে বাজারে যাব।'

বংশীরা চলে যায়।

মল্লিকা বলে, 'বাবা এত ব্যস্ত হবেন না। কষ্ট করে এখন আর বাজারে যেতে হবে না।'

বাকি সকলেও আপত্তি জানায়। এখন বেরুবার দরকার নেই। বাড়িতে যা আছে তাই রান্না হোক।

ইন্দ্রনাথ শুনলেন না। মৃদু হেসে বলেন, 'তাই কখনও হয়। এতদিন পর তোমরা এলে—' অরুণের দিকে ফিরে বললেন, 'তোর মায়ের কথা বলছিলি না? সেও তোদের মতো আজ বাড়িতে থাকতে বলেছে।'

অরুণ বলে, 'আর কিছু জানায়নি?'

'দেবকুমার মজুমদার বলে একজন রিটায়ার্ড জজের কথা বললে। তিনি নাকি

আমার সঙ্গে কি একটা আর্জেন্ট বিষয়ে আলোচনা করতে আসবেন। কিন্তু আসেননি।' বলতে বলতে ছেলেমেয়ে এবং পুত্রবধূদের দিকে তাকান ইন্দ্রনাথ। লক্ষ করেন তাদের চোখে চোখে চাপা হাসির মতো কিছু খেলে যাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে একটু থমকে যান তিনি, তারপর ফের শুরু করেন, 'দেবকুমারবাবু কেন আমার কাছে আসবেন, অনেক বার জিজ্ঞেস করলাম। কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। তোরা সবাই মিলে রহস্য-উপন্যাসের সাসপেন্স তৈরি করতে চাইছিস দেখছি।'

অশোক বলে, 'আরেকটু ওয়েট কর। সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'ঠিক আছে, ওয়েটই করা যাক। তোরা কে কোন ঘরে থাকবি, ঠিক করে নে। প্লেনে এতটা পথ এসেছিস। তার ওপর কাল রাতে নিশ্চয়ই ভাল ঘুম হয়নি। কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে মুখটুখ ধুয়ে ব্রেকফাস্ট করে নিস।' নাতিনাতনিদের উদ্দেশে বলেন, 'দাদাভাই-দিদিভাইরা, তোমাদের সঙ্গে পরে ভাল করে আড্ডা দেওয়া যাবে।'

ওঁদের কথাবার্তার ভেতর ভোলা সন্দেশ-টন্দেশ নিয়ে ফিরে এল। ইন্দ্রনাথ তক্ষুনি তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

বাজার করার কোনোকালেই অভ্যাস নেই ইন্দ্রনাথের। ওটা বংশী বা নরহরিই করে থাকে। কিন্তু আজকের দিনটা একেবারেই আলাদা। এতদিন পর ছেলেমেয়েরা এসেছে। ভেতরে ভেতরে তীব্র আবেগ তাঁকে যেন তোলপাড় করে ফেলছিল।

তিন-চারটে বাজার ঘুরে পাকা রুই, গলদা চিংড়ি, বড় বড় চকচকে পাবদা, পেট লাল কই, মুরগির মাংস, প্রচুর শীতের আনাজ আর ফল কিনলেন ইন্দ্রনাথ। ভোলা সন্দেশ আর ক্ষীরের পানতুয়া এনেছিল। তিনি নাম-করা দোকান ঘুরে আরো কিছু মিষ্টি নিলেন—রাবড়ি, লাল দই আর স্পঞ্জ রসগোল্লা।

ঘণ্টা তিনেক বাদে বাড়ি ফিরে আরেক বার চমক লাগে ইন্দ্রনাথের। গাড়ি থেকে নেমে ভোলাকে মাছমিষ্টিটিষ্টি নামিয়ে আনতে বলে একতলায় আসতেই ওপর থেকে তুমুল হৈচৈ আর হাসির আওয়াজ ভেসে আসে। অনেকে মিলে একসঙ্গে কথা বলছে, ফলে তার একটি বর্ণও বোঝা যাচ্ছে না।

দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে দোতলার হল-ঘরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন ইন্দ্রনাথ। ডাইনিং টেবলে অশোক অমিতদের ভেতর বসে আছেন সুপ্রভা, বড় মেয়ে অঞ্জনা, তার স্বামী শুভময় আর ওদের মেয়ে রিখি। সবার সামনে প্লেটে প্লেটে লুচি-তরকারি, মিষ্টি। একটু দূরে কিচেনের কাছে হরেন বংশী আর নরহরিকে দেখা গেল। যদি কারো কিছু দরকার হয় সেজন্য ওরা অপেক্ষা করছে।

আজ সকাল থেকে একের পর এক চমকে ইন্দ্রনাথ হতচকিত। অশোক,

অমিতদের পর অস্ট্রেলিয়া থেকে সুপ্রভারা যে এসে পড়বেন, এতটা তিনি ভাবতে পারেননি।

ইন্দ্রনাথকে দেখে হৈ-হুল্লোড় থেমে গিয়েছিল। তাঁর দিকে তাকিয়ে সবাই ঠোঁট টিপে হাসছে। সুপ্রভা বলেন, 'কী হল, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি? এস—'

সকালে অমিতদের দেখে অবাক যেমন হয়েছিলেন, তেমনি খুশিও। সুপ্রভারা আসায় আনন্দটা হঠাৎ বহুগুণ বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে তাঁর মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে বেরোয়। পায়ে পায়ে ইন্দ্রনাথ ডাইনিং টেবলের কাছে এসে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়েন।

সুপ্রভা ভুরু সামান্য কুঁচকে সকৌতুকে বলেন, 'ফ্যামিলি রি-ইউনিয়নটা এভাবে হবে, নিশ্চয়ই চিন্তা করতে পারো নি?'

ইন্দ্রনাথ স্ত্রীকে লক্ষ করছিলেন। সুপ্রভার বয়স একষট্টি। এই বয়সেও যথেষ্ট সুন্দরী। চুলের বেশির ভাগটাই কাঁচা, ফাঁকে ফাঁকে অল্প কিছু রুপোর তার। ত্বকের মসৃণতা এখনও নষ্ট হয়ে যায়নি, দাঁতগুলো সবই অটুট। ইওরোপ-আমেরিকার স্বাস্থ্যকর পরিবেশে থেকে ছেলেমেয়েদের মতো তাঁর চেহারাতেও চকমকে পালিশ পড়েছে।

যে আমলে মেয়েরা ইউনিভার্সিটিতে কমই যেত, সুপ্রভা সেই সময়ের এম. এ। খুবই আমুদে, হাসিখুশি, রঙ্গপ্রিয়। সারাক্ষণ গোমড়া মুখে থেকে অন্যের রক্তচাপ বাড়িয়ে জীবন কাটাতে একেবারেই পছন্দ করেন না।

ইন্দ্রনাথ হেসে হেসে বলেন, 'তোমরা সবাই যে চারদিক থেকে চলে আসবে, ভাবিনি।' একটু থেমে বলেন, 'বড় খুকিদের নিয়ে কখন এলে?'

'তুমি বাজারে বেরিয়ে যাবার পরেই। শুনলাম বড় খোকারা কাল দিল্লি থেকে মাঝরাতে কলকাতায় পৌঁছে এয়ারপোর্টে ছিল। আজ সকালে বাড়ি ফিরেছে। আমাদের অত কষ্ট করতে হয়নি। ভোরবেলা বম্বে এসেছি, সেখান থেকে কানেক্টিং ফ্লাইট ধরে কলকাতায়। বাড়ি এসে স্নান টান সেরে ব্রেকফাস্ট করতে বসে গেলাম।'

'একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না।'

'কী?'

'তোমার ছেলেমেয়ে আর ছেলের বৌরা তো শুনি ভীষণ বিজি। এক মিনিটও নষ্ট করার মতো সময় তাদের নেই। কাজকর্ম ফেলে চার কন্টিনেন্ট থেকে হঠাৎ যে তারা উড়ে এল!'

ইন্দ্রনাথের কথাগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম একটু খোঁচা ছিল। সাত-আট বছর আগে সেই যে অশোকরা বিদেশে চলে গিয়েছিল, তারপর এসে বাবাকে দেখে যাবার সময়

পায়নি, এতই নাকি তাদের ব্যস্ততা! এ জন্য যথেষ্ট ক্ষোভ জমা হয়ে ছিল ইন্দ্রনাথের। সেটা যে সুপ্রভা বুঝতে পারেননি তা নয়। তবে এ নিয়ে আবহাওয়া ভারি হয়ে উঠুক সেটা তিনি চান না। হালকা গলায় বললেন, 'কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে।'

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কী সেটা?'

সুপ্রভা বলেন, 'এখন নয়, পরে বলব। হাজার হাজার মাইল ফ্লাই করে আমরা সবাই ভীষণ টায়ার্ড। জেট-ল্যাগ কাটাবার জন্যে কিছুক্ষণ ঘুমনো দরকার।'

ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনি, জামাই এবং পুত্রবধূরা আসায় ইন্দ্রনাথের খুবই ভাল লাগছিল, কিন্তু স্ত্রীকে দেখার পর বুকের ভেতর অন্য ধরনের একটা গাঢ় আবেগ তৈরি হচ্ছিল—সেই যুবা বয়সের মতো। একষট্টি বছরের সুপ্রভা এখনও তাঁর ঝিমিয়ে আসা রক্তে আলোড়ন তোলার ক্ষমতা রাখেন। তাঁকে আলাদাভাবে একটু পাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছিল তাঁর। কিন্তু যিনি শারীরিক ক্লান্তির জন্য ঘুমোতে চাইছেন তাঁকে সে কথা বলা যায় না, বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের সামনে। বললেন, 'ঠিক আছে।'

'তবে তোমাদের যদি ঘুম ভাঙতে দেরি হয়, আমি কিন্তু দুপুরের খাওয়া সেরে নেব।'

স্বামীর প্রতিদিনের রুটিনটা একেবারে ভুলে যাননি সুপ্রভা। ইন্দ্রনাথের চলাফেরা, খাওয়া, পড়াশোনা, প্রাতঃভ্রমণ, বিশ্রাম, ঘুম—সমস্ত কিছুই ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা। নিয়মানুবর্তিতায় এতটুকু হেরফের হবার উপায় নেই। ব্যস্তভাবে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি খেয়ে নিও।'

ছেলেমেয়েরাও সায় দিয়ে বলে, 'আমাদের জন্যে তোমাকে ওয়েট করতে হবে না বাবা।'

ইন্দ্রনাথ এবার অঞ্জনা আর শুভময়কে বলেন, 'তোমাদের সঙ্গে আপাতত কোনো কথা হল না, পরে গল্প করা যাবে।' ওদের মেয়ে রিখি আর অশোকের মেয়ে বনিকে বললেন, 'ম্যাডাম, নতুন বছরে তোমাদের মা তোমাদের যে ছবি পাঠিয়েছিল তা দেখে বোঝাই যায় না এত বড় হয়ে উঠেছ। ইউ হ্যাভ গোন ইনটু বিউটিফুল ইয়াং লেডিজ। তোমাদের যে আমার স্পেশাল কিছু কথা বলার আছে।' বলে হাসি হাসি মুখে মজার একটা ভঙ্গি করলেন।

রিখি আর বনির পরনে জিনস আর ঢোলা শার্ট। চুল ছেলেদের মতো করে ছাঁটা। গায়ের রং টকটকে ফর্সা। চোখের মণি একজনের নীলাভ, আরেক জনের বাদামী। হঠাৎ দেখলে ওদের অভারতীয় মনে হয়। সুদূর বিদেশে থেকে থেকে ওদের চেহারা থেকে বাঙালিত্বের আদলটা প্রায় মুছেই গেছে। পরিবেশের গুণ বা দোষ।

ইংরেজি অ্যাকসেন্টে ভেঙে ভেঙে ওরা বলে, 'কী কথা দাদু?'

বোঝা যাচ্ছিল, বাংলা বলার বিশেষ অভ্যাস নেই নাতনিদের। হয়তো বাড়িতে মা-বাবার সঙ্গে একটু-আধটু বলে থাকে। টেবলের ওপর দিয়ে ওদের দিকে অনেকটা ঝুঁকে ইন্দ্রনাথ ষড়যন্ত্রকারীর মতো চাপা গলায় বলেন, 'সেটা খু-উ-উ-ব সিক্রেট, সবার সামনে কি বলা যায়?' এমনভাবে বললেন যাতে সবাই হেসে ওঠে।

রিখি এবং বনি দু'জনেই দারুণ স্মার্ট, ঝকঝকে মেয়ে। চোখের কোণ দিয়ে ঠাকুরদাকে বিদ্ধ করতে করতে রিখি বলে, 'তোমার সিক্রেট কথাটা কী, আমরা জানি। তবু শোনার জন্যে ওয়েট করব।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। ইটস আ গ্রেট প্রিভিলেজ ফর মি।'

অন্য সবাই হাসতে থাকে।

পাঁচ

অমিতদের ব্রেকফাস্ট হয়ে গেলে ইন্দ্রনাথ ফের তেতলায় নিজের লেখার টেবলে চলে আসেন। কলম খুলে বসেন ঠিকই কিন্তু প্রথম দিকে লেখায় মন বসে না। এমনিতে তিনি আত্মস্থ, শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষ কিন্তু দীর্ঘকাল পর স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা বাড়ি ফিরে আসায় বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যেতে থাকেন।

যদিও সুপ্রভা জানিয়েছেন, ব্রেকফাস্টের পর কিছুক্ষণ ঘুমোবেন, তবু ইন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন একবার তিনি নিশ্চয়ই ওপরে আসবেন। কিন্তু প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল, তিনি এলেন না। দু'বছর ধরে নানা মহাদেশে ঘুরে ঘুরে স্বামী সম্পর্কে তাঁর সমস্ত আবেগ কি নষ্ট হয়ে গেছে? একটা চাপা কষ্ট এবং অভিমান কিছুক্ষণ ইন্দ্রনাথকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তারপর কখন যে নিজের অজান্তে ছড়ানো বিক্ষিপ্ত মনটাকে গুছিয়ে নিয়ে লিখতে শুরু করেন, খেয়াল নেই।

অন্য দিন একটা বাজলেই লেখা বন্ধ করে নিচে খেতে চলে যান ইন্দ্রনাথ। কিন্তু আজ সময়ের হিসেবটা গোলমাল হয়ে গেছে। মিউজিক্যাল ঘড়িতে কখন একটা বেজেছে, লক্ষ করেননি। বংশীর ডাকে মখে মুখ তুলে তাকান। বলেন, 'কিরে, কী হয়েছে?'

বংশী বলে, 'একটা বেজে গেল। খেতে যাবেন নি? সক্কলে নিচে বসে আচেন, আপনারে ডাকতে পেঠোলেন।'

হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে ওঠেন ইন্দ্রনাথ। বলেন, 'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। তুই যা, আমি এক্ষুনি আসছি।'

বংশী নিচে নেমে যায়। ইন্দ্রনাথ পেনের ক্যাপ বন্ধ করে সোজা বাথরুমে চলে যান। ভাল করে হাত ধুয়ে দোতলায় এসে দেখেন, ডাইনিং টেবলে বসে সুপ্রভারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। সবার সামনে নানা সাইজের তিন-চারটে করে প্লেট, কাচের বাটি, জলের গেলাস, চামচ, ন্যাপকিন ইত্যাদি সাজানো রয়েছে। হরেন বংশী আর নরহরি অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, বলামাত্র খাবার দিতে শুরু করবে।

সুপ্রভার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসতে বসতে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'অনেকক্ষণ ঘুমোবে না বলেছিলে? এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়লে?'

সুপ্রভা বলেন, 'শুয়েছিলাম কিন্তু ভাল করে ঘুম এল না।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'খুব বেশি ক্লান্তি থাকলে অনেক সময় ওরকম হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফ্লাই করলে নার্ভের ওপর অসম্ভব চাপ পড়ে। সেগুলো স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ঠিকমতো ঘুম হয় না।'

সুপ্রভা বলেন, 'উঠেই যখন পড়েছি তখন ভাবলাম একসঙ্গে বসে খাওয়া যাক। বড় খোকাদেরও ঘুম আসছিল না, ওরাও উঠে পড়েছিল। বংশীকে বললাম তোমাকে ডেকে নিয়ে আসতে।' একটু থেমে বংশীদের দিকে তাকান, 'সবাইকে দাও।'

বংশীরা প্লেটে প্লেটে ধবধবে ভাত, মাছভাজা, আলুভাজা, বেগুনভাজা, কপির বড়া, মুগের ডাল ইত্যাদি দিতে শুরু করে।

খেতে খেতে সুপ্রভা বলেন, 'তোমাকে আর সাসপেন্সে রাখব না। শেষ যে সারপ্রাইজটা দিতে চাই, এবার শোন।'

উৎসুক চোখে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকান ইন্দ্রনাথ, কিছু বলেন না।

সুপ্রভার ডান পাশে বসে ছিল অশোক। তার দিকে ফিরে তিনি বলেন, 'বড় খোকা, তুই বল।'

অশোক বলে, 'বাবা, আমরা ছোট খুকির বিয়ের ব্যাপারে কলকাতায় এসেছি।'

বিষয়টা বুঝে উঠতে সময় লাগে ইন্দ্রনাথের। বিমূঢ়ের মতো বলেন, 'ছোট খুকির বিয়ে!' তারপরই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর তো সাতাশ চলছে। বিয়েটা এবার দেওয়া দরকার। আগেই ছেলেটেলে দেখা উচিত ছিল। তা—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে আশোক বলে, 'ছেলে দেখতে হবে না বাবা—'

'তবে বিয়েটা হবে কী করে?'

'ছোট খুকি নিজেই ছেলে পছন্দ করেছে। রোহিত ইজ আ ব্রিলিয়ান্ট ব্রাইট ইয়াং ম্যান—'

ফোনেও তো কথা বলতে পারতেন।'

সুপ্রভা হালকা গলায় বলেন, 'হয়তো প্রথমে ঠিক করেছিলেন নিজেই চলে আসবেন। পরে ভেবে দেখেছেন তিনি পাত্রের বাবা। পাত্রীর বাবাই আগে যোগাযোগটা করুন।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'ঠিক আছে, দেবকুমারবাবুর ফোন নাম্বারটা দিও। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলব।'

'শুধু কথা বলা নয়, ওঁকে আর রোহিতকে আমাদের বাড়িতে আসতে বলবে।'

'আচ্ছা—'

একটু চুপচাপ।

তারপর সুপ্রভা বলেন, 'বড় খোকা, মেজ খোকারা দশ দিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। তার ভেতর বিয়েটা কিন্তু সেরে ফেলতে হবে।'

ইন্দ্রনাথ বলে, 'এর মধ্যে বিয়ের ডেট আছে?'

সুপ্রভা জানালেন, পঞ্জিকায় তারিখ না থাকলে পুরুত ডেকে মন্ত্র পড়ে সাত পাক ঘুরিয়ে বিয়েটা দেওয়া যাবে না। এমনিতে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ তো করাতেই হবে। বিদেশে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটটা খুবই দরকার। নইলে বৈধ স্বামী-স্ত্রী হিসেবে রোহিত আর বিপাশার অসুবিধা হবে।

ইন্দ্রনাথের মনটা খুঁত খুঁত করতে থাকে। বিপাশার বিয়েটাই তাঁর জীবনের শেষ বড় কাজ। ওটা হয়ে গেলে সব দায়িত্ব থেকে তাঁর মুক্তি। ভেবেও রেখেছিলেন, ছোট মেয়ের বিয়েটা অন্য ছেলেমেয়েদের মতোই নিখুঁত হিন্দু বিবাহপদ্ধতি অনুযায়ী প্রচুর জাঁকজমক করে দেবেন। তার বদলে কিনা শুধু রেজিস্ট্রি ম্যারেজ! পরক্ষণে ভাবেন, কী আর করা যাবে। এরা এত ব্যস্ত যে দশ দিনের ভেতর বিয়ের তারিখ না থাকলে আরো কিছুদিন যে সেজন্য অপেক্ষা করবে, তার উপায় নেই।

সুপ্রভা বলেন, 'যদি শেষ পর্যন্ত শুধু রেজিস্ট্রি ম্যারেজই হয়, বড় হোটেলে একটা বিরাট করে পার্টি দিও।'

এই বিয়ের ব্যাপারে ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীর সঙ্গে অনেকটাই অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছেন কিন্তু পার্টির কথায় খুবই রেগে যান ইন্দ্রনাথ। বলেন, 'আমাদের বংশে হোটেলে পার্টি দিয়ে কখনও বিয়ের নেমন্তন্ন খাওয়ানো হয়নি। আমাকে যদি ছোট খুকির বিয়েতে থাকতে হয়, বরাবর যা হয়ে আসছে তাই হবে। এ বাড়িতে মেরাপ বেঁধে ভিয়েন বসিয়ে লোক খাওয়াব।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন একটা ঝাঁঝ ছিল যাতে সবাই হকচকিয়ে যায়। স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা শশব্যস্তে বলে ওঠে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি যা বলছ তাই হবে।'

ইন্দ্রনাথ আর কিছু বলেন না। মনের ভেতর যে ক্ষোভ জমা হয়েছিল, ধীরে ধীরে তা কেটে যায়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর ইন্দ্রনাথ বলেন, 'ছোট খুকির বিয়ের জন্যে তোমরা এসেছ। সেটা একরকম ভালই হয়েছে। নইলে এ জীবনে আর হয়তো দেখাই হতো না।'

ছেলেমেয়েরা বিব্রতভাবে বলে, 'এ তুমি কী বলছ বাবা! আমরা প্রায়ই ভাবি কলকাতায় আসব কিন্তু এত কাজের চাপ যে—'

হাত তুলে তাদের থামিয়ে দিতে দিতে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'ওসব কথা থাক। তোমাদের সঙ্গে খুব জরুরি কিছু আলোচনা আছে, সেজন্যে সবার একসঙ্গে বসা দরকার। ভেবেছিলাম দু-এক সপ্তাহের ভেতর ফোনে জানিয়ে দেব। তার আগেই তোমরা এলে।'

ছেলেমেয়েরা চিরদিন লক্ষ করেছে, গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে কথা বলার সময় ইন্দ্রনাথ তাদের 'তুমি' করে বলেন। তারা উৎসুক চোখে তাঁর দিকে তাকায়। অশোক জিজ্ঞেস করে, 'কী বিষয়ে আলোচনা বাবা?'

'তোমরা সবে এসেছ। দেবকুমারবাবুর সঙ্গে কথা বলে ছোট খুকির বিয়ের ডেট ঠিক করে তারপর বসা যাবে।'

'আচ্ছা—'

নাতিনাতনিদের উদ্দেশে এবার ইন্দ্রনাথ বলেন, 'তোমাদের সঙ্গে কোনো কথাই হচ্ছে না। বিকেলবেলাটা এক্সক্লুসিভলি তোমাদের সঙ্গে কাটাব। ওকে?'

বনি রিখিরা একসঙ্গে বলে, 'ওকে দাদু—'

ছয়

খাওয়া-দাওয়ার পর ফের তেতলায় উঠে আসেন ইন্দ্রনাথ। এই সময়টা তিনি কিছুক্ষণ শুয়ে থাকেন। ঠিক ঘুমোন না, একটু ঝিমুনি মতো আসে। ঘণ্টা দেড়েক এইভাবে কাটার পর ধীরে ধীরে উঠে চোখে-মুখে জল দিয়ে কাজে বসে যান।

আজ কিন্তু শুলেন না ইন্দ্রনাথ, লেখার টেবলে গিয়ে বসলেন। সেই সকাল থেকে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে ছেলেমেয়ে জামাই নাতিনাতনিরা আগাম জানান না দিয়ে চলে এসেছে। স্বাভাবিক কারণেই দৈনন্দিন রুটিনে গোলমাল হয়ে গেছে ইন্দ্রনাথের। প্রায় কিছুই লেখা হয়নি।

এই মুহূর্তে লেখার চিন্তাও তাঁর মাথায় নেই। স্ত্রীকে এখন পর্যন্ত একা পাওয়া যায়নি। তাঁর জন্য এক ধরনের ব্যাকুলতা অনুভব করছিলেন তিনি। কেন যেন মনে হচ্ছিল, সুপ্রভা একবার ওপরে আসবেন।

বিশুদ্ধ টেলিপ্যাথি কিনা কে জানে, মিনিট পনের-কুড়ি বাদে সুপ্রভা ওপরে এলেন এবং ডান পাশের একটি চেয়ারে বসলেন। মাথায় খুব সম্ভব হেয়ার টনিক লোশন জাতীয় কিছু মেখেছেন, তার চমৎকার কোমল সুগন্ধ ভেসে আসতে লাগল। পরনে হালকা কাজ-করা টাঙ্গাইল শাড়ি, দুই ভুরুর মাঝখানে লাল গোলাপের ছোট্ট কুঁড়ির মতো সিঁদুরের একটি টিপ। নিবিড় চুল আলগা একটি খোঁপায় আটকানো। সব মিলিয়ে তাঁকে প্রায় অলৌকিক মনে হচ্ছিল।

দু বছর পর সুপ্রভাকে আলাদাভাবে এত কাছে পাওয়া গেল। এই মহিলাটির সঙ্গে যে তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, ভাবতেও আশ্চর্য এক সুখানুভূতি বুকের ভেতর ঢেউ তুলে যেতে লাগল। ইন্দ্রনাথের লোভ হল হাত বাড়িয়ে স্ত্রীকে স্পর্শ করেন কিন্তু তার আগেই সুপ্রভা বলে ওঠেন, 'দেবকুমারবাবুর ফোন নাম্বারটা এনেছি। ওঁকে রিং কর।' বলে ফোন নম্বর লেখা এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দেন।

ভেতরে ভেতরে রীতিমতো গুটিয়ে যান ইন্দ্রনাথ। দু বছরে সব আবেগ কি নষ্ট হয়ে গেছে সুপ্রভার? ঝানু প্রফেসনালদের মতো কাজের কথা ছাড়া আর কি কিছুই বলার নেই তাঁর?

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন ইন্দ্রনাথ। আজ সকালে বাড়ি ফেরার পর একবারও সুপ্রভা জিজ্ঞেস করেননি তিনি কেমন আছেন। অবশ্য দু দিন আগে সিডনি থেকে ফোনে যান্ত্রিক নিয়মে তাঁর শরীরের খোঁজ নিয়েছেন। তাই বলে আরেক বার জানতে চাইলে কী এমন বাড়তি পরিশ্রম হতো?

ইন্দ্রনাথের সবচেয়ে দুর্বলতা তাঁর বইটি সম্পর্কে। স্বাধীনতার পরবর্তী বাঙালি জীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসটির জন্য সারা দেশ উন্মুখ হয়ে আছে। কিন্তু সুপ্রভা সে সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি, অথচ একসময় এই বইটির ব্যাপারে তাঁর কী গভীর আগ্রহই না ছিল! হঠাৎ ইন্দ্রনাথের খেয়াল হল তাঁর সুশিক্ষিত, সফল, বিদেশের ন্যাশানালিটি পাওয়া ছেলেমেয়েরাও কিছুই জানতে চায়নি।

হাত বাড়িয়ে নিঃশব্দে ফোন নাম্বারটা নিয়ে ডায়াল করতে থাকেন ইন্দ্রনাথ। একবারেই লাইনটা পাওয়া যায়।

ইন্দ্রনাথ নিজের নাম জানিয়ে বলেন, 'আমি জাস্টিস দেবকুমার মজুমদার মশায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ওধার থেকে ভারি ধরনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'আপনিই ইন্দ্রনাথবাবু!

নমস্কার। আপনার বাড়িতে যাব বলে ঠিক করেছিলাম। ফোন করে একটা টাইম ফিক্স করব, হঠাৎ তিন দিনের জন্যে কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল, কাল রাতে ফিরেছি। ভেবেছিলাম আজ সন্ধেবেলায় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। কী সৌভাগ্য, আপনিই আগে ফোন করলেন।'

গলা শুনে যেটুকু মনে হলে, প্রাক্তন জজসাহেবটি মানুষ হিসেবে বেশ আন্তরিক, হয়তো বা কিছুটা উচ্ছ্বাসপ্রবণ। ইন্দ্রনাথ বলেন, 'আমার মেয়ে ছোট খুকি মানে বিপাশা আর আপনার ছেলে রোহিত—ওরা একজন আরেকজনকে পছন্দ করে—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে দেবকুমার এবার প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'নিজেদের ছেলেমেয়ে বলে অত রেখে-ঢেকে সঙ্কোচ করে বলতে হবে না স্যার। বলুন চুটিয়ে প্রেম করে ওরা বিয়ের ব্যাপারটা ফাইনাল করে ফেলেছে।'

ইন্দ্রনাথ হকচকিয়ে যান। জজসাহেবটি যে খুবই খোলামেলা এবং তাঁর মুখে যে কিছুই আটকায় না, সেটা বোঝা যাচ্ছে। তা ছাড়া তাঁর মধ্যে রয়েছে চমৎকার সেন্স অফ হিউমার বা কৌতুকপ্রিয়তা যা কিনা আজকাল প্রায় দেখাই যায় না। ইন্দ্রনাথ যদিও গম্ভীর মানুষ কিন্তু মজা-টজা বেশ পছন্দ করেন। তাঁর ধারণা যে হা হা করে হাসে, হৈচৈ বাধিয়ে অন্যাকে মাতিয়ে রাখে কিংবা কথায় কথায় আতসবাজির মতো কৌতুকের ফুলকি ছড়ায় তার মধ্যে আর যাই থাক, কোনোরকম প্যাঁচ থাকে না। দেবকুমারকে খুব ভাল লেগে যায় ইন্দ্রনাথের। তিনি কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই দেবকুমার আবার শুরু করেন, 'বিয়েটা নিজেরা করে নিলেই ঝামেলা মিটে যেত। তা নয়, আমাদের স্যাংশান চায়। আরে বাবা, প্রেম করার সময় কি অ্যাডভান্স অনুমতি নিয়েছিলি! এখন প্যান্ডেলওলাদের কাছে ছোটো, ক্যাটারারদের সঙ্গে কনট্যাক্ট কর, নেমন্তন্নের লিস্ট বানাও, এটা কর, সেটা কর।'

ইন্দ্রনাথ হেসে হেসে বলেন, 'বাবা যখন হয়েছি, এসব তো করতেই হবে।'

'তা বটে।'

'এবার একটা অনুরোধ করছি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, করুন না—'

'আমার ছেলেমেয়েরা বললে রোহিত কলকাতায় এসেছে।'

'হ্যাঁ, সে তো অশোকদের সঙ্গে এক ফ্লাইটেই এসেছে।'

রোহিত যে তাঁর বড় পুত্র, বড় পুত্রবধূ এবং ছোট কন্যার সঙ্গে কলকাতগামী প্লেনে উঠেছিল , সেটা জানা ছিল না ইন্দ্রনাথের। একটু চুপ করে থেকে তিনি বলেন, 'আমার আর আমার স্ত্রীর খুব ইচ্ছে কাল দুপুরে আপনি আর রোহিত যদি দয়া করে আমাদের গরিবখানায় এসে দু'টি শাকভাত খান —'

বলতে বলতে হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ে, কপাল কুঁচকে গেছে সুপ্রভার। খুব চাপা গলায় স্বামীকে তিনি বলেন, 'তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? এতগুলো ছেলেমেয়ের বিয়ে দিলে যে কী করে, ভেবে পাই না। ছেলের বাবাকে কেউ এভাবে খেতে আসতে বলে! আজই ওঁর বাড়িতে গিয়ে নেমন্তন্ন করে এস।'

কথাটা ঠিকই বলেছেন সুপ্রভা। ইন্দ্রনাথ ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়েন। এদিকে টেলিফোনে অনবরত দেবকুমারের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল, 'কী হল স্যার, লাইনটা কি কেটে গেল?'

ইন্দ্রনাথ কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'না না, দেখুন আমার একটা ভীষণ ত্রুটি হয়ে গেছে।'

'কিসের ত্রুটি?'

'আপনার বাড়ি গিয়ে খাওয়ার কথা বলে আসা উচিত। আপনি অনুগ্রহ করে বিকেলে বাড়িতে থাকবেন।'

দেবকুমার একেবারে হুলস্থূল বাধিয়ে দিলেন, 'আপনি অন্য সময় যখন ইচ্ছে পায়ের ধুলো দেবেন কিন্তু এ জন্যে আসতে হবে না। ফর্মালিটি আমার একেবারেই অপছন্দ। কাল দশটার ভেতর দেখবেন ছেলেকে নিয়ে হাজির হয়ে গেছি।'

স্ত্রীকে চোখের কোণ দিয়ে দেখতে দেখতে ইন্দ্রনাথ দ্বিধান্বিতভাবে বলেন, 'কিন্তু—'

'কোনো কিন্তু নয়। হ্যাঁ, শাকভাতের কথা হচ্ছিল না? আমার ব্লাড প্রেসার নর্মাল, রক্তে সুগার নেই, হার্ট সিক্স হর্স পাওয়ারের মতো তেজী, একটাও দাঁত পড়েনি এবং আমি সর্বভুক। দয়া করে এই কথাগুলো একটু মাথায় রাখবেন।'

ইন্দ্রনাথ শব্দ করে হেসে ওঠেন। দেবকুমারের সঙ্গে যত কথা বলছেন, ততই আরো বেশি করে তাঁকে ভাল লাগছে। বললেন, 'কাল আপনাদের জন্যে ইগারলি ওয়েট করব।'

'নমস্কার।'

'নমস্কার।'

ফোন নামিয়ে রেখে সুপ্রভার দিকে তাকাতে চোখে পড়ে তাঁর কপাল আবার মসৃণ হয়ে গেছে, খানিক আগের কুঞ্চন বা ভাঁজ আর নেই।

সুপ্রভা বলেন, 'কুটুম্ব মনের মতো হবে, তাই না?'

বোঝা গেল সুপ্রভা দেবকুমারের কথা না শুনলেও ইন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা শুনে এবং তাঁর চোখমুখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে তাঁদের নতুন আত্মীয় মানুষ হিসেবে কেমন হবেন সেটা আন্দাজ করে নিয়েছেন।

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'কোনোরকম ভ্যানিটি নেই, চমৎকার সেন্স অফ হিউমার, প্রাণখোলা আমুদে মানুষ। এবং ভোজনরসিকও। কথা বলে আমার ভারি ভাল লাগল। কাল ছেলেকে নিয়ে আসছেন। ভাবি বেয়াইমশাইদের কী কী খাওয়াবে, আজই ঠিক করে ফেল।'

'সে তোমাকে ভাবতে হবে না। সব ব্যবস্থা আমি করছি।'

একটু চুপচাপ।

তারপর ইন্দ্রনাথ বলেন, 'দুটো বছর আমেরিকা কানাডা অস্ট্রেলিয়া আর ইংল্যান্ড করে তো বেড়ালে। এবার কিছুদিন আমরা কাছে থাকবে তো?' তাঁর কণ্ঠস্বর গাঢ় শোনায়।

সুপ্রভা তীব্র ভ্রূভঙ্গে স্বামীকে বিদ্ধ করতে করতে বলেন, 'কুড়ি বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছে। তারপর প্রায় একচল্লিশটা বছর তোমার কাছে থেকেছি। ছেলেমেয়েরা দূর দূর দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘুরে ঘুরে তাদের কাছে না গেলে চলে! বিদেশে কিভাবে ওরা সংসার করছে, সেটা তো দেখা দরকার।'

ইন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ সুরে বলেন, 'ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট গ্রোন-আপ, নিজেদের সংসার তারা গুছিয়ে নিতে পারবে। এখন কিছুদিন তুমি বাড়িতেই থাকো।'

'তা কী করে সম্ভব?'

'কেন?'

'ছোট খুকির বিয়ে হয়ে গেলে ওরা নিউ ইয়র্ক চলে যাবে। ওদের নতুন সংসার। মেয়েটা কোনোদিন এক কাপ চা করে খায়নি। আমি না-গেলে একেবারে অথৈ জলে পড়ে যাবে।'

'যাবে না।'

'তার মানে?'

'পৃথিবীতে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে তাদের মায়েদের সাহায্য ছাড়া ঘর-সংসার করছে। তুমি যখন বিয়ের পর এ বাড়িতে এসেছিলে, তোমার মা কি সঙ্গে এসেছিলেন?'

'তুলনা করো না। আমরা দেশে ছিলাম, যখন ইচ্ছে মা এসে দেখে গেছেন। কিন্তু ওরা থাকবে বিদেশে। কী অসুবিধে হবে না হবে, এখান থেকে কেমন করে জানব?'

'কেন, বড় খোকারা রয়েছে। তেমন দরকার হলে ওরা দেখবে।'

'ওরা স্বামী-স্ত্রী এত ব্যস্ত যে নিজেদের সংসার সামলে ছোট খুকিদের দেখাশোনা করা প্রায় অসম্ভব।'

ইন্দ্রনাথ উত্তর দেন না।

সুপ্রভা বলেন, 'ছোট খুকিদের সংসারটা গুছিয়ে দেওয়া ছাড়াও—' বলতে বলতে চুপ করে যান।

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'কী হল, থামলে কেন?'

সুপ্রভা সামান্য ইতস্তত করেন। তারপর বলেন, 'দেখ, আমার এখানে আর ভাল লাগবে না। এতদিন পর এলাম। কলকাতা শহরটা এর মধ্যে আরো নোংরা, আরো জঘন্য হয়ে উঠেছে। এয়ারপোর্ট থেকে সারা পথে যেটুকু চোখে পড়ল—একেবারে নরককুণ্ড। তা ছাড়া বিদেশে এই শহরটার এত বদনাম যে কী বলব!'

কলকাতা নামে জীর্ণ কঙ্কালসার ম্যাড়মেড়ে যে মেট্রোপলিসের অন্তর্জলি যাত্রা শুরু হয়ে গেছে তার তুলনায় চোখ ধাঁধানো লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, টোরোন্টো বা সিডনি তো অলৌকিক স্বপ্নের শহর। সেসব জায়গায় গ্ল্যামার আরাম আর দুরন্ত গতির স্বাদ যারা পেয়েছে তারা কি আর এই শহরে এসে থাকতে পারে? এসব এক নাগাড়ে বলে যান সুপ্রভা।

ইন্দ্রনাথ চমকে উঠেছিলেন। সুপ্রভা কলকাতার এক বিখ্যাত বংশের মেয়ে। বেঙ্গল রেনেসাঁসে ওঁর পূর্বপুরুষেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। সুপ্রভার ঠাকুরদা ছিলেন ন্যাশানালিস্ট মুভমেন্টের একজন বড় মাপের নেতা, বাবা ছিলেন ফ্রিডম ফাইটার, ইংরেজ আমলে বহুবার জেল খেটেছেন। নানা দিক থেকে ইন্দ্রনাথদের পরিবারের সঙ্গে ওঁদের যথেষ্ট মিল। দুই বিখ্যাত বংশে যোগাযোগটা আগেই ছিল। সেটা আরো নিবিড় করার জন্য ইন্দ্রনাথের সঙ্গে সুপ্রভার বিয়ে দেওয়া হয়। বাপের বাড়ি এবং শ্বশুরবাড়ির এমন উজ্জ্বল গৌরবময় ব্যাকগ্রাউন্ড যাঁর, দু বছর ইওরোপ-আমেরিকায় থাকার কারণে তাঁর যে এমন ব্রেনওয়াশ হয়ে যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল? ছেলেমেয়েদের মতো তাদের জননী আর বোধহয় ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালি থাকতে চাইছেন না। বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকেন ইন্দ্রনাথ।

সুপ্রভা বলেন, 'একটা কথা বলব?'

ইন্দ্রনাথ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকান। বলেন, 'কী?'

'তুমিও আমাদের সঙ্গে আমেরিকায় চল। সারা জীবন তো দেশের বাইরে বেরুলে না। কলকাতা আর বাঙালি করে করেই গেলে।'

নিঃশব্দে স্ত্রীকে লক্ষ করতে থাকেন ইন্দ্রনাথ। এই মহিলাটির সঙ্গে একচল্লিশ বছরের বিবাহিত জীবন কাটিয়েছেন, ভাবতে অদ্ভুত লাগল। দু বছর বিদেশ বাসের ফলে পারিবারিক ট্রাডিশান যেন ভুলেই গেছেন সুপ্রভা, জন্মভূমি সম্পর্কে তাঁর আবেগ বিন্দুমাত্র বুঝি অবশিষ্ট নেই। ইন্দ্রনাথের বুকের ভেতর চাপা কষ্ট হতে থাকে।

সুপ্রভা ফের বলেন, 'বাইরে গেলে বুঝতে মানুষ কোথায় পৌঁছে গেছে। ছেলেমেয়েদেরও ইচ্ছে নয়, তুমি একা একা এখানে পড়ে থাকো। তারাও যাবার কথা বলবে।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'ওরা আগেও বলেছে।'

'এবার হয়তো জোর করবে। কি, যাবে তো?'

'ভেবে দেখি।'

'যা ভাবার তাড়াতাড়ি ভেবো। দশ দিন পর কিন্তু সবাই চলে যাবে।'

ইন্দ্রনাথ উত্তর দেন না।

সুপ্রভা ধীরে ধীরে উঠে পড়েন। বলেন, 'আমি যাই, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।' এই তেতলাতেও শোবার ঘর আছে, তিনি সেদিকে চলে যান।

সাত

সুপ্রভা চলে যাবার পর লেখার টেবিলে চুপচাপ বসে থাকেন ইন্দ্রনাথ। দুপুরের শোওয়াটা আজ আর হল না। স্ত্রীর কথা যত ভাবছিলেন মন ততই বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছিল।

বসে বসে কতক্ষণ কেটে গেছে, কখন বাইরে শীতের রোদ বাসি হলুদের মতো ম্যাড়মেড়ে হয়ে উঠেছে, খেয়াল ছিল না ইন্দ্রনাথের। হঠাৎ বংশীর ডাকে চমকে ওঠেন।

'বড়বাবু, চা এনেছি—'

অন্য দিনের মতো আজও বংশী একটা ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম এবং ক'টি বিস্কুট সাজিয়ে এনে টেবলের ওপর রাখে।

ইন্দ্রনাথ নিঃশব্দে উঠে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে লক্ষ করেন ওধারের শোবার ঘরে গভীর ঘুমে ডুবে আছেন সুপ্রভা। একবার ভাবলেন ডাকবেন, পরক্ষণে মনে হল থাক, এতটা পথ প্লেনে এসেছেন, ভাল করে ঘুমোতে পারলে ক্লান্তি কেটে শরীরটা ঝরঝরে লাগবে।

চোখমুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে ফিরে আসেন ইন্দ্রনাথ। নিজের চেয়ারটিতে বসতে বসতে তোয়ালেটা বংশীর হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'বড় খোকারা কি এখনও ঘুমোচ্ছে?'

বংশী বলে, 'না। দাদাবাবুরা, দিদিরা, বৌদিরা খানিক আগে উটেচেন।'

অমিত বলে, 'আমি কী করব?'

'তুই টোরোন্টোয় পড়ে থেকে কী করবি? তুইও আসবি।'

'এসে বেকার বসে থাকব?'

'বেশিদিন ওয়েট করতে হবে না। ম্যাক্সিমাম দু-এক মাস, তার ভেতর ভাল কিছু পেয়ে যাবি। দিস ইজ আমেরিকা। সেখানে কেউ বসে থাকে না। ইটস আ ড্রিমল্যান্ড।'

অমিত একটু চিন্তা করে বলে, 'কিন্তু--'

অশোক বলে, 'কিন্তু কী?'

'আমরা তো কানাডার ন্যাশানালিটি পেয়ে যাচ্ছি আমেরিকায় চ'লে গেলে প্রবলেম হবে না?'

'তুই তো আর ভিখিরির দেশ ইন্ডিয়া থেকে যাচ্ছিস না যে মনে করবে খেতে না পেয়ে গেছিস। কানাডাও যথেষ্ট অ্যাডভান্সড কান্ট্রি। আর তোর যা কোয়ালিফিকেশন তাতে খুশি হয়েই তোকে অ্যাকসেপ্ট করবে। কয়েক বছর থাকার পর আমেরিকার ন্যাশানালিটি পেতে অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।'

সিঁড়ির মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে বিমূঢ়ের মতো অশোকদের কথা শুনছিলেন ইন্দ্রনাথ। কিছুই যেন বুঝতে পারছিলেন না। ইংরেজি আর বাংলা মিশিয়ে ওরা যে সব শব্দ উচ্চারণ করছে, সবই তাঁর জানা কিন্তু তবু আশ্চর্য রকমের দুর্বোধ্য। তাঁর ছেলেমেয়েরা কেউ কানাডিয়ান, কেউ অস্ট্রেলিয়ান, কেউ ব্রিটিশ কিন্তু সবার লক্ষ্য আমেরিকা, সবার গন্তব্য আমেরিকা। পৃথিবী নামে এই গ্রহটিতে ওই মহাদেশটিই একমাত্র এল ডোরাডো—যেখানে পৌঁছুতে না পারলে জীবন একেবারে ব্যর্থ। অজস্র অর্থ, অঢেল আরাম, বাধাবন্ধহীন উদ্দাম লাইফ স্টাইল—এসব ছাড়া ওরা আর কিছু বোঝে না। কোন দেশে ওদের জন্ম, কোন বংশের তারা সন্তান, কী উজ্জ্বল তাদের পারিবারিক ট্র্যাডিশন—সব ভুলে গেছে অশোকরা।

এরা ইন্দ্রনাথের ছেলেমেয়ে, এদের সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তবু কেমন যেন অপরিচিত। যে অশোক, অমিত, অরুণরা একদিন এ বাড়িতে থাকত, তাদের সঙ্গে এই মানুষগুলোর মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ইন্দ্রনাথ আর দাঁড়ান না, ধীরে ধীরে নামতে থাকেন। এতক্ষণ খেয়াল করেননি, হঠাৎ জোরালো ওয়স্টোর্ন পপ মিউজিকের আওয়াজ কানে ভেসে আসে। তিনি লক্ষ করেন, ডান পাশে একেবারে কোণের দিকের ঘরটায় বনি, রণি, ডোনা আর রিখি গানের তালে তালে তুড়ি দিয়ে দিয়ে, শরীর বাঁকিয়ে চুরিয়ে অত্যন্ত অশ্লীল ভঙ্গিতে নেচে চলেছে।

বুকের ভেতর নতুন করে ধাক্কা লাগে ইন্দ্রনাথের। তিনি শুনেছেন, এ বাড়িতে একসময় চারণ কবি মুকুন্দ দাস এসে স্বদেশী গান শুনিয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন রবিবাবু নামে বেশি পরিচিত, এ বাড়িতে দু'একবার গান গেয়ে গেছেন। তা ছাড়া এসেছেন ডি. এল. রায়, আরো পরে তাঁর ছেলে দিলীপকুমার রায়। ইন্দ্রনাথের বাবা প্রীতিভূষণের ক্লাসিকাল গানের শখ ছিল। তাঁর আমলে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিখ্যাত সব শিল্পীদের ডেকে এনে আসর বসাতেন। ইন্দ্রনাথও গানবাজনা খুব পছন্দ করেন। সে সব বিশুদ্ধ ভারতীয় রাগসঙ্গীত। তবে কখনও শিল্পীদের বাড়িতে এনে তাঁর বাবার মতো মজলিশ বসাননি। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হলে রেডিও, টিভি বা রেকর্ড প্লেয়ারে ভক্তিগীতি বা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে থাকেন কিন্তু বিদেশি পপ মিউজিক নাতিনাতনিদের হাত ধরে এই প্রথম 'মুখার্জি সদন'-এ ঢুকল।

রিখি, বনিদের কথা দিয়েছেন বিকেলটা তাদের সঙ্গে কাটাবেন। তাই লম্বা হল পেরিয়ে কোণের দিকের ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ান ইন্দ্রনাথ। নাচতে নাচতেই নাতিনাতনিরা কোরাসে চেঁচিয়ে ওঠে, 'হাই দাদু—'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'এসব কী হচ্ছে?'

রিখি বলে, 'ডান্স উইদ মিউজিক।'

আগে রেকর্ডে ওয়েস্টার্ন গান বা বাজনার দু'এক টুকরো যে ইন্দ্রনাথের কানে ভেসে আসেনি তা নয়। ক্যাবারে বা বিদেশি পপ ডান্সের কথা তিনি শুনেছেন, তবে চোখে দেখেননি। এমন অশালীন নোংরা অঙ্গভঙ্গির নাম যে নাচ হতে পারে এবং তা 'মুখার্জি সদন'-এ নিজের চোখে দেখতে দেখতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

অশোকের মেয়ে বনি এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। সে আবছাভাবে ইন্দ্রনাথের অস্বস্তির কারণটা বুঝতে পারছিল। তাঁকে কিঞ্চিৎ নাজেহাল করার জন্যই বুঝিবা বলে ওঠে, 'কাম অন দাদু, জয়েন আস—'

একেবারে থ বনে যান ইন্দ্রনাথ। গম্ভীর গলায় বলেন, 'এসব বন্ধ কর।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে নাচ-গান থেমে যায়। ঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে বলেন, 'তোমাদের আমার কিছু বলার আছে।'

তিনি ভেবে রেখেছিলেন, বিকেলবেলাটা নাতিনাতনিদের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি মজা-টজা করে কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু চড়া মিউজিকের সঙ্গে অশালীন শরীর ঝাঁকানো দেখার পর সিদ্ধান্ত পালটে ফেলেন।

নাতিনাতনিরা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কোনো প্রশ্ন করে না।

ইন্দ্রনাথ গভীর স্বরে বলেন, 'তোমরা কোন বংশের ছেলেমেয়ে, সেসব কি তোমাদের মা-বাবারা কখনও জানিয়েছে?'

রিখি ইংরেজির সঙ্গে ভাঙা ভাঙা কদর্য বাংলা মিশিয়ে বলে, 'হ্যাঁ। শুনেছি আমাদের বংশ ইজ গ্রেট।'

'আর কিছু জানায়নি?'

'নো।'

'শোন, আমাদের পূর্বপুরুষেরা সোসাল রিফর্মে, স্বাধীনতা সংগ্রামে, এডুকেশানে, বাঙালির কালচারে গ্লোরিয়াস পার্ট প্লে করে গেছেন। বেঙ্গল রেনেসাঁসের ইতিহাসে মুখার্জি বংশের নাম সোনার অক্ষরে লেখা আছে। এসব তোমাদের জানা উচিত।' বলতে বলতে আবেগে ইন্দ্রনাথের গলা কাঁপতে থাকে।

ইন্দ্রনাথ যা বলছেন তা তাঁর নাতিনাতনিদের কাছে গ্রহান্তরের কোনো অজানা ভাষার মতো দুর্বোধ্য। তারা পরস্পরের দিকে তাকাতে থাকে।

ইন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন, যে ভাষায় তিনি বংশের মহিমা বর্ণনা করতে চাইছেন সেগুলো ওদের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কমিউনিকেশনে কোথায় যেন বড় রকমের ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সহজ করে বোঝাবার জন্য তিনি ফের শুরু করেন, 'তোমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে কোন বংশের সন্তান তোমরা, অতীত তোমাদের কত গৌরবময়। আচারে-ব্যবহারে, শিক্ষায়-রুচিতে তার উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে—'

হঠাৎ থেমে যান ইন্দ্রনাথ। নাঃ, নাতিনাতনিদের বোধগম্য হয়, এমন ভাষা বোধহয় তাঁর জানা নেই। বেশ হতাশাই বোধ করেন তিনি।

বনি এবার বলে, 'দাদু, এসব তো পাস্ট। এ দিয়ে কী হবে? টোটালি ইউজলেস। আমরা যেখানে আছি, যা পড়ি, যেভাবে ফিউচারের কথা ভাবছি তার সঙ্গে বেঙ্গল রেনেসাঁস-টাঁসের কোনো সম্পর্ক নেই।'

ইন্দ্রনাথ ভেতরে ভেতরে একটা ধাক্কা খান। ইওরোপ-আমেরিকা নাতিনাতনিদের মধ্যে নিজেদের পিতৃভূমি, নিজেদের বিরাট বংশ এবং মহান সব পূর্বপুরুষ সম্পর্কে কোনো সেন্টিমেন্টই গড়ে উঠতে দেয়নি। তাদের বংশগৌরব নেই, অতীত সম্পর্কে মোহ নেই। বর্তমান আর ভবিষ্যৎ ছাড়া অন্য কিছু ওরা বুঝতে চায় না।

রিখি হালকা গলায় বলে, 'তুমি যে কমপ্লেক্স সেনটেন্সে ভারি ভারি খটমট কী সব বললে—ওগুলো আমাদের কাছে ভেরি মাচ পাজলিং। এখানে আসার সময় ভেবে রেখেছিলাম তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। ফ্র্যাংকলি উত্তর দেবে?'

'ও, সিওর। জানা থাকলে নিশ্চয়ই দেব।'

'ঠাম্মা তো দু'বছর ধরে লন্ডন নিউ ইয়র্ক টোরোন্টো আর সিডনি করে বেড়াচ্ছে। এর ভেতর তোমার কোনো গার্লফ্রেন্ড জোটেনি?'

স্পষ্টভাবে শোনার পরও নিজের কান দুটোকে যেন বিশ্বাস করতে পারেন না ইন্দ্রনাথ। তাঁর চোখের তারা দুটো একেবারে স্থির হয়ে যায়। নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, 'গার্লফ্রেন্ড!'

রিখি ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে চোখ সরু করে নিঃশব্দে হাসছিল। ইন্দ্রনাথের যে ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে সেটা টের পেয়ে তার ভীষণ মজা লাগছে। বলে, 'ইয়া দাদু, ঠাম্মা নেই, মহিলা ছাড়া একা একা লাইফ কাটানো যায়? টোটালি বোরিং অ্যান্ড ডিসগাস্টিং—'

মেয়েটা যে অত্যন্ত ফাজিল, এঁচড়ে পাকা, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না ইন্দ্রনাথের। তার কথায় সেক্সের চাপা গন্ধ। লক্ষ করলেন অন্য নাতিনাতনিরা তাঁর অস্বস্তিতে ঠোঁট টিপে হাসছে। এরা যে অত্যন্ত ধুরন্ধর, হাসির ধরন দেখে আন্দাজ করা যাচ্ছে।

ধাতস্থ হতে খানিকটা সময় লাগে ইন্দ্রনাথের। ঠাকুরদা হিসেবে হালকাভাবেই ব্যাপারটা নেওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাঁর স্বভাবটাই গম্ভীর ধরনের। ঠাট্টা-টাট্টাগুলো শালীনতার সূক্ষ্ম সীমারেখা ছাড়ালেই বিরক্ত হন।

হঠাৎ কিছু একটা মনে হতে ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'আমার গার্লফ্রেন্ড সম্বন্ধে তো খোঁজ নিচ্ছ। তোমার বয়ফ্রেন্ড আছে?'

সমস্ত শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে তুমুল শব্দ করে হাসতে থাকে রিখি। যেন এমন অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কথা আগে আর কখনও শোনেনি। বলে, 'গ্র্যান্ড পা, য়ু আর আ স্ট্রেঞ্জ ফেলা—'

বয়ফ্রেন্ডের কথায় এত হাসির কী কারণ থাকতে পারে ভেবে পাচ্ছিলেন না ইন্দ্রনাথ। হতভম্বের মতো বলেন, 'কী হল, এত হাসছ কেন?'

হাসির তোড় একটু কমলে রিখি বলে, 'দাদু, তুমি বাইরের ওয়ার্ল্ডের খবরই রাখো না। ইওরোপ অস্ট্রেলিয়া আমেরিকায় এমন কোনো মেয়ে পাবে না যার বয়ফ্রেন্ড নেই।'

নাতনির চোখের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'তার মানে তোমারও আছে।'

মাথা সামান্য হেলিয়ে রিখি বলে, 'অফ কোর্স। পিটার ইজ মাই বয়ফ্রেন্ড। ভেরি নাইস ইয়াং ফেলা। বিজনেস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়ছে।'

মুখার্জি বংশের একটি মেয়ে তার পুরুষবন্ধু সম্পর্কে এভাবে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, এ ছিল ইন্দ্রনাথের পক্ষে অভাবনীয়। রিখির লজ্জা, সঙ্কোচ, শালীনতাবোধ বলতে কিছুই নেই। তিনি একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েন।

রিখি এবার বলে, 'জানো দাদু, আমরা উইক-এন্ডে মাঝে মাঝে অনেক দূরে

কান্ট্রি সাইডে চলে যাই। দু-একদিন কাটিয়ে আসি।'

ইন্দ্রনাথ রিখির পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করেন, 'সঙ্গে কে যায়—তোর মা না বাবা?'

'ও গড—' বলেই সারা ঘর তোলপাড় করে হাসতে শুরু করে রিখি। এমন বিস্ময়কর কথা সে আগে কখনও শোনেনি। হাসতে হাসতেই বলে, 'ওল্ড ম্যান, ইয়াং চ্যাপ আর ইয়াং গার্লের সঙ্গে ওয়াচডগ হিসেবে ওদেশে কোনো মা-বাবাই যায় না।'

ইওরোপ আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার পারমিসিভ সোসাইটির কথা শুনেছেন ইন্দ্রনাথ। কিন্তু সেটা যে তাঁর নাতিনাতনিদের ভেতর ঢুকে গেছে, কে জানত! তাঁর মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে।

অশোকের মেয়ে বনি এই সময় বলে ওঠে, 'দাদু, আমারও বয়ফ্রেন্ড আছে। তার নাম ফিলিপ—অ্যাংলো-ইতালিয়ান। ওর বাবা ব্রিটিশ, মা ইতালির মেয়ে। ওকে দেখলে তোমার খুব ভাল লাগবে।'

এরা কারা? তাঁরই বংশধর কি? বড় খোকা, বড় খুকিরা নিশ্চয়ই তাদের ছেলেমেয়েদের কীর্তিকলাপের কথা জানে। জেনেশুনেও হয়তো চোখ বুজে আছে।

বনি আবার বলে, 'রিখিদের মতো আমরাও কোনো সমুদ্রের ধারে ছুটিটুটি কাটাতে যাই।'

ইন্দ্রনাথ প্রায় বোবা হয়ে যান। হঠাৎ মনে পড়ে, কোনো একটা কাগজে যেন পড়েছিলেন, ওদেশে মায়েরা তাদের টিন-এজার মেয়েরা বাইরে কোথাও বেরুলে তাদের ব্যাগে বার্থ-কনট্রোল পিল দিয়ে দেয়। রিখির মা অঞ্জনা আর বনির মা মল্লিকা সেরকম কিছু দেয় কিনা ভাবতেও সাহস হয় না।

বনি আর রিখি ঠাকুরদাকে লক্ষ করছিল। তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে রিখি কাছে এগিয়ে আসে। জিজ্ঞেস করে, 'তুমি ভীষণ পিউরিটান, তাই না দাদু?'

ইন্দ্রনাথ উত্তর দেন না। নিজের নাতিনাতনিদের তিনি বুঝতে পারছেন না, কোথায় একটা বিরাট কমিউনিকেশন গ্যাপ হয়ে গেছে। রিখিরা আর বাঙালি বা ভারতীয় নেই—অস্ট্রেলিয়ান আমেরিকান বা ব্রিটিশ হয়ে গেছে। তবু ওদের মা-বাবার কাছে জানতে হবে কেরিয়ার আর টাকার জন্য বিদেশে পড়ে থেকে ছেলেমেয়েদের কতটা সর্বনাশ তারা করতে চায়।

ইন্দ্রনাথ আর দাঁড়ান না, তীব্র অস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে রিখিদের ঘর থেকে বাইরের হল-এ চলে আসেন। পঁচিশ ফুট দূরে অন্য একটি ঘরে অশোকরা তখনও 'আমেরিকা' 'আমেরিকা' করে যাচ্ছে।

আট

পরদিন দশটা বাজার কয়েক মিনিট আগেই প্রাক্তন জজ সাহেব দেবকুমার মজুমদার তাঁর ছেলে রোহিতকে নিয়ে 'মুখার্জি সদন'-এ এলেন।

টেলিফোনে কাল দেবকুমার যা বলেছিলেন, দেখা গেল তার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়। সুগঠিত দারুণ স্বাস্থ্য তাঁর। রিটায়ার যখন করেছেন তখন ষাট নিশ্চয়ই পেরিয়েছে। এই বয়সেও তাঁর চুল কুচকুচে কালো। গায়ের রং বাদামী, চামড়া এখনও মসৃণ। চৌকো ধরনের মুখ, দৃঢ় চোয়াল। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। হাইট ছ ফিটের কাছাকাছি।

রোহিত খুবই সুপুরুষ। মাথায় বাবার চেয়ে তিন চার ইঞ্চি বেশি লম্বা। লম্বাটে বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, চওড়া কপাল, চুল ব্যাক-ব্রাশ করা। রং পাকা গমের মতো। সমস্ত চেহারা টান-টান। দেখামাত্রই টের পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রখর এক ব্যক্তিত্ব রয়েছে।

দেবকুমারদের খুব সমাদর করে দোতলার হল-এ এনে বসানো হল। ইন্দ্রনাথরা তাঁদের ঘিরে বসলেন।

হাসি হাসি মুখে দেবকুমার ইন্দ্রনাথকে বলেন, 'আপনাদের কাউকেই আগে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তবে অনুমান করছি আপনি ইন্দ্রনাথবাবু, উনি শ্রীমতী সুপ্রভা মুখার্জি।' বিপাশাকে দেখিয়ে বললেন, 'ওকেও চিনতে পারছি। আমার পুত্র নিউ ইয়র্কে প্রেম করার সময় ওর ছবি পঠিয়েছিল। এবার অন্যাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন।'

দেবকুমারের মুখে কিছুই যে আটকায় না, সেটা কালই টের পাওয়া গিয়েছিল। সবাই হাসতে থাকে। কিন্তু ছেলেমেয়ে নাতিনাতনিদের সামনে এ জাতীয় মজা ইন্দ্রনাথকে কিছুটা বিব্রত করে।

পরিচয়-পর্ব শেষ হল দেবকুমার বলেন, 'কাল ফোনে যে কথা হয়েছিল, মনে আছে তো?'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'বিয়ের তারিখের ব্যাপারে?'

'সেটা তো আছেই। ওই যে বলেছিলাম আমার হজমশক্তিটা এই বয়সেও প্রচণ্ড। লোকে বলে বয়স বাড়লে নাকি খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে আসক্তি কমে যায়। আমার কিন্তু স্যার ওটা বেড়েই চলেছে।'

কাল দেবকুমারের সঙ্গে ফোনে তাঁর যা কথোপকথন হয়েছিল, বিশেষ করে খাওয়ার ব্যাপারটা—স্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন ইন্দ্রনাথ। ভাবী আত্মীয়দের

ভোজের যাবতীয় দায়িত্ব নিজের হাতে তখনই তুলে নিয়েছিলেন সুপ্রভা। কাল বংশী আর ভোলাকে নিয়ে বেশ কিছু বাজার করেছেন। আজও ভোরে উঠে দু'জনকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। রাজকীয় আয়োজন করেছেন তিনি।

সুপ্রভা হেসে হেসে বলেন, 'শুনে খুব আনন্দ হল মজুমদার সাহেব। আজকাল লোকে আর খেতে পারে না। পাখির মতো কী যে একটু খায়।'

দেবকুমার বলেন, 'এই করেই তো বাঙালি জাতটা গেল। জোরে হাসতে পারে না, বুক চিতিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটার শক্তি নেই, মেপে মেপে খায়। সব দিক থেকেই আমরা ছোট হয়ে যাচ্ছি।'

এরপর জমিয়ে খাওয়ার গল্প শুরু করলেন দেবকুমার। সারা জীবন বিয়েবাড়িতে, অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্নে বা দিল্লিতে থাকতে বড় বড় পার্টিতে কী বিপুল পরিমাণে খেয়ে লোকের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তার অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে যেতে লাগলেন।

এর মধ্যে সুপ্রভা এবং অঞ্জনা প্রাথমিক আপ্যায়নের জন্য চা, শরবত, সন্দেশ, কাজুবাদাম, পেস্ট্রি, কেক, সরভাজা, চমচম ইত্যাদি নিয়ে এসেছেন। এইসব সুখাদ্য এবং পানীয়ের কোনোটা সম্পর্কেই দেবকুমারের বিন্দুমাত্র অরুচি নেই। নিরপেক্ষভাবে সবগুলিরই সদ্‌গতি করতে লাগলেন। বাবার তুলনায় রোহিতের কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে তেমন একটা আগ্রহ নেই। খুব সামান্যই সে খেল।

এদিকে দেবকুমার ভোজনের ব্যাপারে যেভাবে তাঁর দিগ্বিজয়ের কাহিনী ফেঁদেছেন তাতে সহজে থামবেন বলে মনে হয় না। কাজের কথাটা এখনও শুরুই করা যায়নি।

হঠাৎ হাতজোড় করে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'খুবই জরুরি আলোচনা হচ্ছে। এর ফাঁকে আমি মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আপনার কাছে চাইছি।'

দেবকুমার এতই মগ্ন হয়ে ছিলেন যে চমকে ওঠেন। বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কিছু বলবেন?'

'এই ওদের বিয়ের বিষয়টা। ডেট তো একটা ঠিক করে ফেলতে হয়।'

'অবশ্যই। আপনারা যেদিন বলবেন সেদিনই বিয়ে হবে। কালকেই তো কথা হয়ে গেল।'

'তা ছাড়া অন্য ফর্মালিটি—'

'কিসের ফর্মালিটি?' বলতে বলতে যেন কিছু খেয়াল হয় দেবকুমারের, 'আপনি বোধহয় ডাউরি-টাউরির কথা বলতে চাইছেন। আই হেট ইট স্যার। আই হ্যাভ এনাফ, আমার ছেলে বিরাট চাকরি করে, আপনার মেয়েও একজন টপ একজিকিউটিভ। আর কী দরকার? কিচ্ছু দিতে হবে না।'

সুপ্রভা বলেন, 'এই আমাদের শেষ কাজ। না দিলে কি ভাল লাগে?'

একটু ভেবে দেবকুমার বলেন, 'ঠিক আছে, দু-একটা গয়না-টয়না দেবেন। আসবাব-টাসবাব একেবারেই না, আমার ওসব রাখার জায়গা নেই। যাদের দেবেন তারাও ঘাড়ে করে আমেরিকায় নিয়ে যাবে না। তা ছাড়া ভবিষ্যতের জন্যে আমি পরিকল্পনাও করে ফেলেছি।'

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কী পরিকল্পনা?'

তক্ষুনি উত্তর দেন না দেবকুমার। বেশ খানিকক্ষণ পর বলেন, 'পরে আপনাকে বলছি।' তারপর ফের খাওয়ার গল্পে ফিরে যান।

কাঁটায় কাঁটায় একটায় সুপ্রভা বলেন, 'দয়া করে একটু উঠতে হবে যে—'

দেবকুমার লক্ষ করলেন, ডাইনিং টেবলে নয়, রঙিন উলের নকশা-করা বড় বড় পশমী আসন পেতে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে হল-এর একধারে—মেঝেতে। উৎসুক সুরে বলেন, 'ও, আহারের ব্যাপার। সময় নষ্ট করার মানে হয় না।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান।

শুধু ভাবী কুটুম্বদের জন্য নয়, বাড়ির সবার জন্য আসন পাতা হয়েছে, শুধু সুপ্রভা বাদ। বংশীকে নিয়ে নিজের হাতে তিনি পরিবেশন করবেন।

প্রচুর আয়োজন করা হয়েছে। পদ কি দু-একটা? পেস্তাবাদাম এলাচ লবঙ্গ দিয়ে ঘি-ভাত, ভেটকির ফ্রাই, ইলিশ মাছের ডিম আর তপসে ভাজা, মাছের মাথা দিয়ে ঘন মুগের ডাল, আলু-ফুলকপির তরকারি, রুইয়ের কালিয়া, তেল-কই, দই-ইলিশ, চিংড়ির মালাইকারি, চাটনি, রাবড়ি, সরভাজা, ক্ষীরের পানতুয়া, রাজভোগ এবং জল-ভরা সন্দেশ।

খেতে খেতে তারিফের ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন দেবকুমার আর বলেন, 'সুপার্ব। বেয়ানের হাতে ম্যাজিক আছে।' বলেই কী খেয়াল হতে সুপ্রভার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ছেলের বিয়ে হবার আগেই বেয়ান বলে ফেললাম কিন্তু—'

সুপ্রভা হেসে হেসে বলেন, 'বিয়ে তো একরকম হয়েই গেছে। বলবেন বৈকি।'

হৈ হৈ করে গল্প করতে করতে খাওয়া চলতে থাকে। একসময় দেবকুমার ইন্দ্রনাথকে বলেন, 'তখন একটা পরিকল্পনার কথা বলছিলাম না—'

উৎসুক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'হ্যাঁ। কী সেটা?'

'ছেলে ছাড়া আমার কেউ নেই। বিয়ের পর বৌমাকে নিয়ে নিউ ইয়র্ক চলে যাবে। কথা বলে মনে হয়েছে দেশে ফেরার আর সম্ভাবনা নেই। ওখানকারই ন্যাশানালিটি নেবে।' বলতে বলতে একটু থামেন দেবকুমার। তারপর খানিক চিন্তা করে আবার শুরু করেন, 'সোনু চাইছে আমি ওর কাছে নিউ ইয়র্কে চলে যাই।' সোনু

রোহিতের ডাক-নাম।

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'দু'চার দিনের জন্যে তো ঘুরে আসতেই পারেন।'

'দু'চার দিন বা দু-চার মাস নয়।'

'তবে?'

'পার্মানেন্টলি। যতই যুবকদের মতো ঘুরে বেড়াই, গ্লাটোনদের মতো খাই, বয়স তো হয়েছে। একা একা এখানে পড়ে থাকব, সোনুর একেবারেই তা ইচ্ছা নয়।'

খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ইন্দ্রনাথের। বলেন, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আপনি যে বাড়িতে থাকেন সেটা নিশ্চয়ই নিজেদের।'

'হ্যাঁ। আমার ঠাকুরদা ওটা করিয়েছিলেন প্রায় ষাট-সত্তর বছর আগে, এই সেঞ্চুরির শুরুর দিকে। সোনুকে ধরলে ওখানে আমাদের ফোর্থ জেনারেশন চলছে।'

'তা হলে তো আপনারা এই শহরের অনেক দিনের সিটিজেন।'

'তা বলতে পারেন।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'আপনি কি নিউ ইয়র্কে চলে যাবার ডিসিসান নিয়ে ফেলেছেন?'

দেবকুমার বলেন, 'মোটামুটি। ছেলে ভীষণ প্রেসার দিচ্ছে। বয়স বাড়লে মন দুর্বল হয়ে যায়। তখন সন্তানদের কাছে থাকতে ইচ্ছে করে।'

ইন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন, দেবকুমার আমেরিকায় চলে যাবেনই। কলকাতার পুরনো বাসিন্দারা কেউ চিরকালের মতো এই শহর ছেড়ে চলে গেলে তাঁর কষ্ট হয়। বললেন, 'কিন্তু আপনাদের বাড়ি, তার কী হবে?'

দেবকুমার একটু হেসে বলেন, 'আমি আমেরিকায় চলে যাব, আর বাড়িটা এখানে ফাঁকা পড়ে থাকবে, তা তো হয় না। ভাবছি ওটা বিক্রিই করে দেব।'

অবাক বিস্ময়ে ইন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপর প্রতিধ্বনির মতো করে বলেন, 'বিক্রি করে দেবেন! এই শহরে আপনাদের এতকালের রুট। সেটা তুলে চলে যাবেন?'

দেবকুমার বলেন, 'কী আর করা যাবে? সেন্টিমেন্ট নিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। রিয়ালিটিটা বুঝতে হবে। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'এই শহরটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। সিভিক অ্যামেনিটিজ বলতে কিছুই নেই। আপনি বাড়ি থেকে বেরুলে কখন ফিরতে পারবেন, গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় না। রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা, আবর্জনা ডাঁই হয়ে আছে। এসব বাদ দিলেও শহরটা সম্পর্কে গর্ব করার কিছু নেই। রেপ, খুন, মারদাঙ্গা লেগেই আছে।'

দেবকুমার যা বললেন তার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়। এসব এই শহরের দৈনন্দিন ঘটনা। তবু কলকাতাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারেন না ইন্দ্রনাথ। কী বলবেন, ঠিক করতে না পেরে বিভ্রান্তের মতো তিনি তাকিয়ে থাকেন।

দেবকুমার এবার বলনে, 'আমরা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হতে চলেছি। একটা কথা বলব?'

ব্যস্তভাবে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'শুনেছি আপনার ছেলেমেয়েরা সবাই ফরেনে থাকে। বেয়ানও আজ আমেরিকা, কাল ইওরোপ করে বেড়াচ্ছেন। ওদের কারোরই দেশে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। আপনি একা একা কলকাতায় পড়ে আছেন। আপনার—'

কথাটা শেষ করতে পারেন না দেবকুমার, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'আপনি কি বলতে চান, বুঝতে পারছি। কলকাতা থেকে রুট তুলে নিয়ে আমেরিকায় চলে যাই—এই তো?'

দেবকুমার হাসিমুখে এবং একটু জোর দিয়েই বলেন, 'একজাক্টলি। দুই বেয়াই এক জায়গায় থাকব। শেষ জীবনটা চমৎকার কেটে যাবে।

'আমাদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনি কি জানেন?'

'নিশ্চয়ই। স্বাধীনতা সংগ্রামে, বেঙ্গল রেনেসাঁসে আপনাদের কনট্রিবিউশানের কথা কে না জানে? কিন্তু সেসব অতীতের কথা।'

ইন্দ্রনাথ হঠাৎ খুব বিমর্ষ বোধ করেন। তাঁর ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনি, এমন কি স্ত্রীর মতো অতীত সম্পর্কে বিন্দুমাত্র মোহ নেই দেবকুমারের। বংশগৌরব, দেশকে নিয়ে অহঙ্কার—এসব প্রাক্তন এই জজ সাহেবটির কাছে মূল্যহীন, অনাবশ্যক। ইন্দ্রনাথ চুপ করে থাকেন।

দেবকুমার আবার বলেন, 'আমার কথাটা একটু ভেবে দেখবেন।'

ইন্দ্রনাথ এবারও উত্তর দেন না।

সবাই ওঁদের কথাবার্তা চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। সুপ্রভা এই সময় বলে ওঠেন, 'বেয়াইমশাই, এই ব্যাপারটা আমার স্বামীটিকে ভাল করে বোঝান।'

আরো কিছুক্ষণ আমেরিকার স্বপ্নবৎ জীবনযাত্রা সম্পর্কে ইন্দ্রনাথকে উসকে দিতে চেষ্টা করেন দেবকুমার কিন্তু ইন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া বোঝা যায় না।

বিকেলে হীরের নেকলেস দিয়ে বিপাশাকে আশীর্বাদ করলেন দেবকুমার, তারপর পরদিন রাত্রে গোটা মুখার্জি পরিবারকে খাওয়ার নেমন্তন্ন করে ছেলেকে নিয়ে চলে গেলেন। ঠিক হল, ওই সময়ই রোহিতকে ইন্দ্রনাথদের পক্ষ থেকে আশীর্বাদ করা হবে।

নয়

দেবকুমারদের পুরনো আলিপুরের বাড়িটা 'মুখার্জি সদন'-এর মতো বিশাল না হলেও বেশ বড়ই। বিরাট কমপাউন্ডের মাঝখানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বড় বড় থামওলা দোতলা। সামনে লন, বাগান, পেছনেও বাগান এবং কাজের লোকেদের থাকার জায়গা, গ্যারেজ ইত্যাদি।

বিকেলেই স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং নাতিনাতনিদের নিয়ে তিনটে গাড়ি বোঝাই হয়ে চলে এসেছিলেন ইন্দ্রনাথ। দেবকুমার প্রথমে তাঁদের বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখালেন। তারপর চা-টা খেতে খেতে শুরু হল জমজমাট আড্ডা। সেটা চলল আটটা-সাড়ে আটটা পর্যন্ত। তারপর রোহিতকে আশীর্বাদ করে খাওয়া-দাওয়া চুকোতে চুকোতে সাড়ে দশটা বেজে গেল।

এবার বিদায় নেবার পালা।

একটা গাড়িতে অরুণ, মল্লিকা, ডোনা, রিখি, বিনিতা আর অঞ্জনা চলে গেল। পরের গাড়িটায় গেল অমিত, বনি, রণি আর মাধবী। শেষ গাড়িটায় যাবেন ইন্দ্রনাথ, সুপ্রভা, বিপাশা, অশোক আর শুভময়।

দেবকুমার আর রোহিত ইন্দ্রনাথদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিচে নেমে এসেছিলেন। তাই ওদের বেরুতে একটু দেরি হয়ে গেল। ফলে তিনটে গাড়ির একসঙ্গে যাওয়া সম্ভব হল না।

রাস্তায় এসে দেখা গেল চারদিক সুনসান। যতদূর চোখ যায় কুয়াশায় মোড়া। মাঝে মাঝে হেডলাইট জ্বালিয়ে কোনো অপার্থিব ভৌতিক যানের মতো দু-একটা প্রাইভেট কার কুয়াশা ফুঁড়ে ফুঁড়ে উলটো দিক থেকে ছুটে আসছে। মানুষজনের দেখা নেই, ক্বচিৎ এক-আধজন সারা শরীর শীতের পোশাকে ঢেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে কোথায় উধাও হয়ে যাচ্ছে কে জানে। হিম থেকে বাঁচবার জন্য হয়তো নিরাপদ কোনো আশ্রয়ে।

গাড়িটা চালাচ্ছিল ভোলা। তার পাশে বসেছে অশোক আর শুভময়। পেছনের সিটে ইন্দ্রনাথ, বিপাশা এবং সুপ্রভা।

সুপ্রভা সমানে ভোলাকে হুঁশিয়ারি দিতে থাকেন, 'এই, সাবধানে চালাবি। যা হিম, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অ্যাকসিডেন্ট না হয়ে যায়।'

ভোলা স্টিয়ারিংয়ে হাত এবং উইন্ডস্ক্রিনের বাইরে চোখ রেখে মাঝে মাঝে বলে উঠছে, 'ভয় পাবেন না মা। আমার গাড়িতে কখনও অ্যাকসিডেন্ট হয় না।'

ফ্রন্ট সিটে অশোক আর শুভময় রোহিতদের সম্পর্কে কথা বলছিল। বাবা-ছেলের নির্ঝঞ্ঝাট ফ্যামিলিতে গিয়ে ছোট খুকি অর্থাৎ বিপাশা যে খুব সুখী হবে, সে ব্যাপারে দু'জনেই একমত।

ডান দিকের জানালার ধারে দূরমনস্কর মতো বসে ছিলেন ইন্দ্রনাথ। ছেলে জামাই বা স্ত্রীর কোনো কথা তাঁর কানে ঢুকছিল না। বারবার শুধু দেবকুমারদের বাড়িটার ছবি তাঁর চোখের সামনে অদৃশ্য কোনো টিভি-পর্দায় ফুটে উঠছিল। এমন চমৎকার পিতৃপুরুষের বাড়িটা বেচে দিয়ে ভদ্রলোক কিনা আমেরিকায় চলে যেতে চাইছেন! খুব খারাপ লাগছিল ইন্দ্রনাথের।

গাড়িটা ন্যাশনাল লাইব্রেরি ডাইনে রেখে, আরো খানিকটা এগিয়ে চিড়িয়াখানার পাশ দিয়ে সোজা চলে আসে রেস্ কোর্সের কাছে। সেখান থেকে ডাইনে ঘুরে ভিক্টোরিয়ার কাছাকাছি আসতেই প্রচণ্ড জোরে ব্রেক কষে ভোলা। পিচের রাস্তায় টায়ার ঘটানোর কর্কশ আওয়াজ ওঠে—ঘ্যাস্‌স্‌—

এদিকে গাড়ির ভেতরে সবাই সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সুপ্রভার থুতনি আর ইন্দ্রনাথের কাঁধ ফ্রন্ট সিটের পেছন দিকটায় ধাক্কা খেয়ে থেঁতলে যায়। বাদবাকিরা খানিকটা সামলে নিলেও তাদের হাত কপাল বা হাঁটুও ছড়ে-টড়ে গেছে।

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, 'এটা কী হল ভোলা, এত জোরে ব্রেক কষে!'

ভোলার নাকে চোট লেগে রক্ত ঝরতে শুরু করেছিল। রুমাল বার করে নাকে চেপে ধরতে ধরতে সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়, 'ওই দেখুন—'

সবার চোখে পড়ে পনের-কুড়ি ফুট দূরে দুটো মোটরবাইক রাস্তার মাঝখানে আড়াআড়ি দাঁড় করানো রয়েছে। সময়মতো ব্রেক না কষলে ওগুলোর সঙ্গে ধাক্কা লেগে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেত। ভোলা সতর্ক ছিল বলে অনিবার্য দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে।

অশোক খেপে গিয়েছিল। উত্তেজিত স্বরে বলে, 'স্কাউন্ড্রেলের দল, এভাবে কেউ গাড়ি রাখে—' তারপরই জানালার কাচ খুলে চেঁচিয়ে ওঠে, 'কার গাড়ি—অ্যাই কার গাড়ি, হঠাও এখান থেকে।'

কোনো সাড়া পাওয়া যায় না।

মোটরবাইক দুটো এমনভাবে দাঁড় করানো যে পাশ কাটিয়ে যাবার উপায় নেই। দু ধারেই জায়গা খুব কম। যে দিক দিয়েই যাওয়া যাক, ইন্দ্রনাথের অ্যামবাসাডর কাত হয়ে নির্ঘাত রাস্তার নিচে পড়ে যাবে।

অগত্যা দরজা খুলে নেমে পড়ে অশোক এবং তার সঙ্গে শুভময়ও। কেউ যখন সাড়া দিচ্ছে না, নিজেরাই বাইক দুটো সরিয়ে পথ করে নেবে। কিন্তু কয়েক পা

এগুতে না এগুতেই আচমকা কুয়াশা ফুঁড়ে তিনটে চোয়াড়ে ধরনের যুবক বেরিয়ে আসে। তাদের তিনজনের হাতেই ছোরা, কুয়াশা-মাখানো রাস্তার আলোতেও লিকলিকে ফলাগুলো ঝকঝক করছিল।

যুবকদের পরনে টাইট জিনসের ওপর চামড়ার জ্যাকেট। তাদের হিংস্র চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছিল মার্ডারটা ওদের কাছে কোনো ব্যাপারই না। এবার বোঝা গেল, গাড়ি থামাবার জন্য ওরা মোটরবাইক দুটো ওভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল অশোক আর শুভময়। তারা তিন যুবকের দিকে চোখ রেখে পিছু হটতে হটতে গাড়ির দিকে যেতে থাকে। আর শিকারী চিতার মতো তাদের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে তিন যুবক।

অশোকরা টের পাচ্ছিল তাদের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। প্রাণপণে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল কিন্তু স্বর ফুটল না।

ওদিকে গাড়ির ভেতর থেকে এবার তিন যুবককে দেখতে পান ইন্দ্রনাথরা। ওদের উদ্দেশ্য বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। তিনি চিৎকার করে ওঠেন, 'এই—তোমরা কারা? কী চাও—অ্যাঁ—'

একটা যুবক চোয়াল শক্ত করে চাপা গলায় হিন্দি ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে শাসায়, 'ওল্ড ম্যান, চিল্লাও মাত। হল্লা-গুল্লা করলে—' ছুরি দিয়ে গলা কাটার ভঙ্গি করে বলে, 'হামেশাকি লিয়ে জবান বন্ধ করার বন্দোবস্ত করব। যা আছে, সব বার করে দাও—'

ইন্দ্রনাথ ভীষণ রেগে যান, 'কী পেয়েছ তোমরা?এটা মগের মুল্লুক?'

পাশ থেকে কাঁপা কাঁপা, ভয়ার্ত সুরে সুপ্রভা স্বামীকে বলেন, 'কী করছ তুমি! প্রাণটা চলে যাবে। যা আছে দিয়ে দাও। বড় খোকা, শুভময়, তোমরাও ঘড়ি পার্স-টার্স দাও—' বলে নিজের চুড়ি হার-টার খুলতে শুরু করেন।

অশোক আর শুভময় ততক্ষণে গাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছে। তিন যুবক এগিয়ে এসে অ্যামবাসাডরটাকে ঘিরে ফেলেছে। ইন্দ্রনাথ ছাড়া বাকি সবাই যখন টাকাপয়সা আর গয়না-টয়না দিতে যাবে, সেই সময় যুবকদের নজর এসে পড়ে বিপাশার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে চোখে চোখে কী এক ইঙ্গিত খেলে যায়। এক যুবক হাত তুলে বলে, 'টাকা, অর্নামেন্ট কিছু চাই না। ওই আনারকলিকে শুধু নামিয়ে দাও—' বলে বিপাশাকে দেখিয়ে দেয়।

অশোক শুভময় আর সুপ্রভা হাতজোড় করে ভীরু গলায় বলে, 'এ তোমরা কী বলছ ভাই! ও তোমাদের বোনের মতো—'

একটা ছোকরা বলে, 'শাট আপ।' বলে বিপাশাকে নামাবার জন্য দরজা ধরে

টানাটানি শুরু করে। কিন্তু ভেতর থেকে ওটা লক-করা। মুহূর্তে পকেট থেকে স্টিলের পাঞ্চ বার করে হাতে গলিয়ে এক ঘায়ে জানালার কাচ ভেঙে লক খুলে ফেলে। তারপর বিপাশার হাত ধরে টানতে থাকে।

এমন মারাত্মক বিপজ্জনক অবস্থায় কখনও পড়েনি বিপাশা। সমানে কাঁদতে শুরু করে সে, আতঙ্কে তার দুই চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

অশোক আর শুভময় হাতজোড় করেই ছিল। তারা কাতর গলায় একটানা বলে যেতে থাকে, 'তোমরা যত টাকা চাও দেবো—টোয়েন্টি থাউজেন্ড, থার্টি থাউজেন্ড—এনি অ্যামাউন্ট।'

সব কিছু দেখতে দেখতে মাথার ভেতর বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছিল ইন্দ্রনাথের। এক ধাক্কায় যুবকটিকে দশ হাত দূরে ছিটকে পেলে মধ্যরাতের নিঝুম ময়দান কাঁপিয়ে গর্জে ওঠেন, 'খবরদার জানোয়ারের দল—তারপরেই হিতাহিতজ্ঞানশূন্যের মতো লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমে যান। চিরকালের গম্ভীর, নির্বিরোধ, অন্তর্মুখী শিক্ষাব্রতীর ভেতর থেকে দুঃসাহসী ভয়ঙ্কর একটি মানুষ যেন বেরিয়ে আসে। সুপ্রভা প্রাণপণে দু হাতে তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করেও পারেন না।

একজন শান্তশিষ্ট বয়স্ক ভদ্রলোক যে এমন পালটা আক্রমণ করে বসতে পারে, ছোকরা ভাবতে পারেনি। এ জাতীয় মানুষ এমনিতে ভীরু, কাপুরুষ ধরনের হয়ে থাকে। বুকে ছুরি বা রিভলবারের নল ঠেকালে ঘড়ি আংটি মানিব্যাগ তো বটেই, পরনের জামাকাপড় পর্যন্ত সুড়সুড় করে খুলে দেয়। কিন্তু এই বুড়ো লোকটা একেবারে আলাদা ধাতের।

হুড়মুড় করে রাস্তায় পড়ে যেতে যেতে প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল ছোকরা। পরক্ষণে খানিকটা সামলে নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে এবং হাতের ছুরিটা নাচাতে নাচাতে প্রচণ্ড আক্রোশে ইন্দ্রনাথের দিকে তেড়ে আসে। ততক্ষণে অন্য দুই ছোকরাও তাঁর দু পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখে মনে হচ্ছিল ওদের মাথায় খুন চেপে গেছে।

গাড়ির ভেতর থেকে ব্যাকুলভাবে সুপ্রভা বলে যাচ্ছিলেন, 'ওঁকে মেরো না বাবারা, মেরো না—'

শুভময় আর অশোক ঘ্যানঘেনে গলায় বলে যাচ্ছিল, 'যত টাকা চাও—পঞ্চাশ হাজার, এক লাখ। বাবাকে মেরো না।'

ইন্দ্রনাথ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও ভয় পাননি। তিনটে উদ্যত ছুরির ফলার আক্রমণ কিভাবে ঠেকাবেন সেটা ঠিক করতে না পেরে পিছু হাঁটছিলেন।

মারাত্মক কিছু একটা ঘটে যেতে পারত কিন্তু তার আগেই আচমকা মাটি ফুঁড়ে

কোথেকে যেন একটা মেয়ে উঠে এল, পরনে সালোয়ার কামিজের ওপর পুল-ওভার। কুয়াশা-জড়ানো ঝাপসা আলোতেও মনে হয় তার বয়স তিরিশের কাছাকাছি। সে সমাজের কোন অন্ধকার স্তরের বাসিন্দা সেটা তার মুখেচোখে পরিষ্কার ফুটে আছে। শীতের এই মধ্যরাতে নিশ্চয়ই শিকারের সন্ধানে ময়দানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

'এই হারামীরা, বাবুর গা থেকে এক ফোঁটা রক্ত বেরুলে তোদের জানে খেয়ে ফেলব।' বলে ইন্দ্রনাথকে আগলে দাঁড়িয়ে পড়ে মেয়েটা।

ছোকরা তিনটে থমকে গিয়েছিল। কয়েক সেকেন্ড মাত্র। তারপরই একসঙ্গে হুমকে ওঠে, 'ভাগ হিঁয়াসে—'

ওদের ওপর দিয়ে তিন পর্দা গলা চড়িয়ে মেয়েটা চিৎকার করে, 'তোরা ভাগ, কুত্তার পাল। একটু আগে গাড়ির ওই মেমসাহেবের হাত ধরে টানছিলি। এখন এই বাবুকে খুন করতে চাইছিস। কী ভেবেছিস তোরা?'

বোঝা যাচ্ছিল মেয়েটা দারুণ বেপরোয়া, বিন্দুমাত্র মৃত্যুভয় নেই। তা ছাড়া খানিক আগে বিপাশার হাত ধরে টানাটানিটা সে লক্ষ করেছে।

একটা ছোকরা হিংস্র ভঙ্গিতে তার দিকে এগিয়ে আসে। সাপের হিসহিস আওয়াজের মতো শব্দ করে সে শাসায়, 'ড্যাগার পেটে পুরে না দিলে রেন্ডিটা থামবে না। শালীকে এবার মজা মালুম পাইয়ে দিচ্ছি—'

কিন্তু ছোকরা কিছু করা বা বোঝার আগেই মেয়েটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদিকে অন্য দুই ছোকরা ছুটে গিয়ে মেয়েটার গায়ে এলোপাথাড়ি ছোরা চালাতে থাকে। মুহূর্তে তার সারা গা রক্তে ভেসে যায়।

নিরস্ত্র মেয়েটার কিন্তু সেদিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ নেই। সে যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে। খালি হাতে মরিয়ার মতো তিন হত্যাকারীর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে।

এমন দৃশ্য হলিউডের কোনো অ্যাকশান-প্যাকড ছবিতেও বড় একটা দেখা যায় না। গাড়ির ভেতর সবাই রুদ্ধশ্বাসে বসে থাকে। তারপর হঠাৎ বিপাশা আর অশোক কাঁপা কাঁপা শিথিল গলায় বলে, 'বাবা, চলে এস, চলে এস—'

দুর্বোধ্য স্বরে সুপ্রভা কী বলতে চান কিন্তু গোঙানির মতো একটা আওয়াজ বেরোয় শুধু।

শুভময় বলে, 'আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না বাবা, শীগগির আসুন।'

ভোলা বলে, 'মেয়েমানুষটা লড়ে যাক। বড়বাবু, আপনি গাড়িতে উঠুন, আমি ব্যাক করে পিজি' র পাশ দিয়ে চলে যাব।'

ইন্দ্রনাথ ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, জামাই, কারো কথাই শুনতে পাচ্ছিলেন না। তিন ক্রিমিনালের সঙ্গে একটি অসীম সাহসী মেয়ের সাঙঘাতিক যুদ্ধ তাঁকে যেন বিহ্বল করে ফেলেছিল। হঠাৎ তাঁর মনে হল, যে মেয়েটা তাঁদের জন্য জীবন বিপন্ন করেছে, তাকে বাঁচানোর জন্য কিছু করা দরকার। উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে করতে তিনি গলার স্বর যতটা উঁচুতে তোলা সম্ভব তুলে চেঁচাতে থাকেন, 'পুলিশ—পুলিশ—'

ডাকাডাকিতে কাজ হয়। সার্কুলার রোডের দিক থেকে একটা পুলিশ ভ্যান গাঁক গাঁক আওয়াজ করতে করতে এদিকে ছুটে আসে। কুয়াশা ভেদ করে গাড়িটার হেডলাইটের তীব্র আলো এসে পড়ে ইন্দ্রনাথদের ওপর।

তিন ঘাতক আর দাঁড়ায় না, বেগতিক দেখে মোটর-বাইকে চড়ে বিদ্যুৎগতিতে বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামের দিকে উধাও হয়ে যায়। আর মেয়েটা রক্তাক্ত, বেহুঁশ অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকে।

পুলিশের গাড়িটা ইন্দ্রনাথদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। চেহারা দেখে মনে হল পেট্রোল ভ্যান।

গাড়ি থেকে একজন কম বয়সের সার্জেন্ট নেমে আসে। অন্যেরা নামে না। পেছনের সিটে চারটি আর্মড গার্ড আর সামনের দিকে ড্রাইভার বসে থাকে।

সার্জেন্ট জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যাপার? এত রাতে আপনারা এখানে কী করছেন?

ইন্দ্রনাথ নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, 'সব বলছি। আগে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন।' বলে মেয়েটাকে দেখিয়ে দেন।

প্রাক্তন হলেও ইন্দ্রনাথ যে নাম-করা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, তাতে কাজ হয়। সসম্ভ্রমে ও শশব্যস্তে সার্জেন্ট বলে, 'হ্যাঁ স্যার—নিশ্চয়ই—' বলেই আর্মড গার্ডদের দিকে তাকায়, 'তাড়াতাড়ি নেমে ওই মেয়েটাকে ভ্যানে তুলুন। পিজিতে নিয়ে যেতে হবে।'

আর্মড গার্ডরা নেমে এসে রক্তাক্ত মেয়েটাকে ধরাধরি করে ভ্যানে তুলে ফেলে।

পুলিশ দেখে অশোকরা নেমে পড়েছিল। সার্জেন্ট তাদের দেখতে দেখতে ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করে, 'এঁরা?'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'আমার ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, জামাই আর ড্রাইভার।'

সার্জেন্ট বলে, 'আপনাদের একটু কষ্ট করে আমাদের সঙ্গে হাসপাতালে আসতে হবে স্যার।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'নিশ্চয়ই।'

হাসপাতলে এসে সার্জেন্টটি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেয়েটাকে প্রথমে এমার্জেন্সি

তোমাদের নেই?'

বিশাল হল-ঘরটায় মুহূর্তে অদ্ভুত স্তব্ধতা নেমে আসে।

ইন্দ্রনাথ কারো দিকেই তাকান না। কিছুক্ষণ পর বলেন, 'আমি তো মেয়ের লাঞ্ছনা দেখতে পারি না, তাই গাড়ি থেকে নেমে যেতে হয়েছিল।'

ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিল অশোক আর শুভময়। অশোক কুণ্ঠিতভাবে এবার বলে, 'আমরা তো গুণ্ডাগুলোকে টাকা দিতে চেয়েছিলাম—'

'টাকার লোভ দেখিয়ে ওদের ঠেকাতে চেয়েছিলে। কিন্তু ওরা কি রাজি হয়েছিল?'

'পঞ্চাশ হাজারে রাজি হয়নি। এক লাখ দিলেই আর গোলমাল করত না। কিন্তু সেটা বলার আগেই তো তুমি রেকলেসের মতো নেমে গেলে। ওভাবে মৃত্যুকে কেউ ডেকে আনে! যেখানে টাকার পরিমাণ বাড়ালে কাজ হয়ে যায়—'

অন্য সবাই, এমন কি সুপ্রভাও বললেন, 'ঠিকই তো।'

ইন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হয়ে যান। এরাই তাঁর সন্তানসন্ততি এবং স্ত্রী! সব ভীরু, কাপুরুষ কিন্তু চতুর। টাকার মাপেই সব কিছু ওরা ওজন করে। তিনি অশোককে বললেন, 'তোমার কথা থেকে দুটো জিনিস পরিষ্কার হল। এক, আমার নেমে যাওয়া রেকলেসের মতো হয়েছে। দুই, তোমার ছোট বোনের সম্মানের দাম এক লাখ টাকা।' তাঁর কণ্ঠস্বরে এই প্রথম ঝাঁঝ ফুটে বেরোয়।

অশোক হকচকিয়ে যায়। বিব্রতভাবে বলে, 'তুমি ওভাবে বলছ কেন বাবা! টাকা দিলে যেখানে সমস্যা এড়ানো যায় সেখানে অকারণ ঝুঁকি নিয়ে কী লাভ?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন ইন্দ্রনাথ, তীব্র একটু হাসি ফুটে ওঠে তাঁর মুখে। বলেন, 'রাইট, রাইট। কিন্তু এবার তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

পুরনো ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী তাদের এই গোলমেলে বাবাটি কী প্রশ্ন করবেন, বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকে অশোক। তার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল।

ইন্দ্রনাথ বলে, 'ওই মেয়েটি সম্বন্ধে তুমি কী বলবে? ও তো টাকার জন্যে আমাকে বাঁচায়নি। সে ছুটে এসে হুলিগানগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়লে আমি মার্ডার হয়ে যেতাম। নিজের প্রাণ দিয়ে সে আমাকে বাঁচাতে চেয়েছিল। এর জন্যে নিশ্চয় সে টাকাপয়সা কিছু চায়নি।'

এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন সুপ্রভা। ইন্দ্রনাথের কথাগুলোর ভেতর যে সূক্ষ্ম অথচ তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতটি রয়েছে তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি তাঁর। ক্ষোভের সুরে বলেন, 'এসব কী কথা! নিজের ছেলে-জামাইয়ের সঙ্গে রাস্তার এক নোংরা মেয়ের তুলনা করছ!'

শান্ত, ধীর ভঙ্গিতে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'আমি কিছুই করছি না। যা ঘটেছে শুধু তাই মনে করিয়ে দিচ্ছি।'

'বেশ তো, মেয়েটা বেঁচে উঠলে ভাল অ্যামাউন্টের একটা টাকা ওকে দেওয়া যাবে।'

'আমার জীবনের মূল্য?'

সুপ্রভা বলেন, 'সমস্ত ব্যাপারটা তুমি অমন বাঁকাভাবে নিচ্ছ কেন?' তাঁর বলার ভঙ্গিতে তীব্র বিরক্তি ফুটে বেরোয়।

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'আমার প্রাণরক্ষার জন্যে বড় খোকা টাকা দিতে চাইছে। সেটা মূল্য নয়?' বলে সোজাসুজি স্ত্রীর চোখের দিকে তাকান।

কথাগুলো এমনই কঠোর চাঁছাছোলা সত্য যে অস্বীকার করার উপায় নেই। সুপ্রভা ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যান। ইন্দ্রনাথের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলেন, 'তুমি তো আগে এরকম ছিলে না।'

ইন্দ্রনাথ নিরুত্তেজ শান্ত সুরে বলেন, 'অনেক বদলে গেছি, তাই না?' বলতে বলতে হঠাৎ উঠে পড়েন, 'অনেক রাত হল, এবার সবাই শুয়ে পড়।' বলেই কোনো দিকে না তাকিয়ে ধীরে ধীরে তেতলার সিঁড়ির দিকে চলে যান।

মধ্যরাতে রেস কোর্সের সামনের সেই মারাত্মক ঘটনাটিকে ঘিরে যে অপ্রীতিকর আলোচনা শুরু হয়েছিল, আচমকা ইন্দ্রনাথ এভাবে তার সমাপ্তি ঘটাবেন তা যেন ভাবা যায়নি। হল-ঘরে বিমূঢ়ের মতো বসে থাকেন সুপ্রভারা।

দশ

সেই যে অশোকরা এসেছিল তার সাতদিনের ভেতর বিয়েটা হয়ে যায় বিপাশার।

'মুখার্জি সদন'-এর বিশাল ছাদের গোটাটা জুড়ে কলকাতার সবচেয়ে নাম-করা ডেকরেটরকে দিয়ে প্যাণ্ডেল করিয়েছিলেন ইন্দ্রনাথ। সামনের বাগানের ধার ঘেঁষে তোলা হয়েছিল চমৎকার একটা সামিয়ানা। ক্যাটারারদের ওপর খাওয়ানোর ভার দেন নি, বাড়ির পেছন দিকে ভিয়েন বসানো হয়েছিল। গেটের কাছে নহবত বানিয়ে চিৎপুরের বিখ্যাত সানাইওলাদের আনিয়ে তিন দিন দিবারাত্রি বাজাবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আত্মীয়স্বজন ছাড়া কলকাতার এলিট সোসাইটির প্রায় সবাইকেই নেমন্তন্ন করেছিলেন ইন্দ্রনাথ। সবাই বলাবলি করছিল, এটাই নাকি এই মেট্রোপলিসে এই

সেঞ্চুরির শেষ দশকের সব চেয়ে চমকপ্রদ বিয়ের অনুষ্ঠান।

প্রচণ্ড ব্যস্ততা এবং তুমুল হৈচৈ-এর মধ্যেও রোজ তিন চার বার সেই সার্জেন্টটিকে তো বটেই, হাসপাতালে ফোন করে সেই মেয়েটির খবর নিয়েছেন ইন্দ্রনাথ।

সার্জেন্টটির নাম সুনির্মল হালদার। গোড়ার দিকে আপনি করে বললেও পরে তুমি বলতে শুরু করেছেন ইন্দ্রনাথ। সেটা অবশ্য সুনির্মলের জন্যই। সে খুবই বিনীতভাবে জানিয়েছে, ইন্দ্রনাথ বয়সে অনেক বড় তো বটেই, তিনি একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এবং সম্মানিত মানুষ, তাকে আপনি করে বললে ভীষণ অস্বস্তি হয়।

সুনির্মল জানিয়েছে মেয়েটির নাম মালতী। তিন দিন বেহুঁশ হয়ে থাকার পর তার জ্ঞান ফিরেছে। আপাতত সে আছে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। প্রাণের আশঙ্কা অনেকটা কেটে গেছে। তবে এলোপাথাড়ি ছুরি মেরে তার বুক পিঠ তলপেট আর কিডনির এমন ক্ষতি করা হয়েছে যে বেঁচে গেলেও সুস্থ হতে অনেক সময় লেগে যাবে।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেছেন, 'মালতীর বাড়িতে খবর দিয়েছ?'

সুনির্মল বলেছে, 'ওর কেউ নেই স্যার।'

বেশ অবাক হয়েই ইন্দ্রনাথ বলেছেন, 'নেই মানে!'

একটু ইতস্তত করে সুনির্মল উত্তর দিয়েছে, 'এ জাতীয় মেয়েদের কেউ থাকে না।'

বিমূঢ়ের মতো ইন্দ্রনাথ এবার বলেন, 'মালতীকে জিজ্ঞেস করেছিলে?'

'পাঁচ মিনিটের জন্যে হাসপাতালে আমাকে একবার ওর সঙ্গে দেখা করতে দিয়েছিল। ও বললে ওর কেউ নেই।'

'ও থাকে কোথায়?'

'নর্থ ক্যালকাটার একটা গলিতে।'

'আত্মীয়স্বজন মা-বাবা না থাক, ওর ঘনিষ্ঠ লোকজন সেখানে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই থাকে। তাদের জানানো দরকার।'

'ও নিয়ে আপনি ভাববেন না স্যার। মালতীর জন্যে ওর প্রতিবেশীরা কেউ মাথা ঘামাবে না।'

একটু চুপ করে থেকে ইন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মালতীর চিকিৎসার জন্যে টাকাপয়সা কী দরকার বল?' যখনই সুনির্মলের সঙ্গে কথা হয় এই প্রশ্নটা করে থাকেন তিনি।

সুনির্মল একই উত্তর দিয়ে যায়, 'না স্যার, আপাতত কিছু দরকার নেই।'

'তেমন বুঝলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে। টাকার জন্যে ওর চিকিৎসার যেন

ত্রুটি না হয়। যা লাগে আমি দেব।'

'ঠিক আছে স্যার, নিশ্চয়ই জানাব।'

ইন্দ্রনাথ বলেছেন, 'একটা পারবিারিক ব্যাপারে ক'টা দিন খুব ব্যস্ত আছি। সেটা মিটলেই মালতীকে হাসপাতালে দেখে আসব।'

সুনির্মল বলেছে, 'আপনি আর কষ্ট করে যাবেন কেন? আমিই তো রোজ হাসপাতালে গিয়ে ওর খবর নিয়ে আপনাকে জানাচ্ছি।'

'তুমি কি আমাকে যেতে বারণ করছ?'

'না, মানে—'

গলার স্বর শুনে মনে হয়েছে সুনির্মল হয়তো হকচকিয়ে গেছে। ইন্দ্রনাথ বলেছেন, 'থেমে গেলে কেন? বল—'

সুনির্মল বিব্রতভাবে এবার বলেছে, 'আপনার মতো এত বড় একজন মানুষ, ওই রকম একটা মেয়েকে দেখতে যাবেন? আমি কী বলছি, আশা করি বুঝতে পারছেন—'

'তা পারছি। কিন্তু কৃতজ্ঞতা বলে একটা কথা আছে তো। আমি এক মুহূর্তের জন্যে ভুলতে পারি না, মালতী আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, আমার মেয়ের সম্মান রক্ষা করেছিল।'

একটু চুপচাপ।

তারপর সুনির্মল বলেছে, 'ঠিক আছে। যাবার আগে আমাকে একটা ফোন করে দেবেন। আমি তখন হাসপাতালে থাকব।'

ফোনের এই কথোপকথন বাড়ির কারো কাছেই গোপন নেই। লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু করেন না ইন্দ্রনাথ। সবার সামনেই তিনি সুনির্মলের সঙ্গে কথা বলেন। এ জন্য ছেলেমেয়ে পুত্রবধূরা খুবই বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট। তবে মুখ ফুটে কারো কিছু বলার সাহস নেই। শুধু সুপ্রভা চুপ করে থাকেন না।

একদিন সুনির্মলের সঙ্গে কথা বলার পর ইন্দ্রনাথ যখন ফোন নামিয়ে রাখছে সেই সময় সুপ্রভা প্রায় আগুনখাকীর মতো ছুটে আসেন। বলেন, 'এটা কী হচ্ছে রোজ রোজ?'

ঠাণ্ডা চোখে স্ত্রীর দিকে তাকান ইন্দ্রনাথ, কোনো উত্তর দেন না।

গলা আরো চড়িয়ে সুপ্রভা এবার বলেন, 'একটা রাস্তার মেয়েমানুষকে নিয়ে এ তুমি কী শুরু করলে?'

শান্ত, অবিচলিত মুখে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'মানুষ হিসেবে যা করা উচিত তাই করছি।'

'খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'তাই মনে হচ্ছে তোমাদের?'

'শুধু আমাদের কেন, যারা এসব শুনবে তাদেরই মনে হবে।'

স্ত্রীর দিকে ক'পা এগিয়ে গিয়ে ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'মনুষ্যত্ব বলে একটা কথা আছে, সেটা কি জানো?'

সুপ্রভা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে বলেন, 'না। মনুষ্যত্বের মহিমা শুধু তোমারই জানা আছে।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'এ নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। প্লিজ স্টপ ইট।'

সুপ্রভা নাছোড়বান্দা ভঙ্গিতে বলেন, 'কিছুতেই না। কৃতজ্ঞতার দাম হিসেবে মেয়েটাকে কিছু টাকা দিয়ে ব্যাপারটা বন্ধ করে দাও। গুড বি ক্লোজড ফর গুড।'

'টাকা দেবার কথা তোমার ছেলেরা আর তুমি আগেও বলেছ। কথাটা আমার মনে আছে। তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পদ্ধতি সবার কিন্তু এক নয়।'

সুপ্রভা এবার খেপে যান। বলেন, 'তার মানে তোমার পদ্ধতি অনুযায়ী নোংরা মেয়েটার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যাবে?'

ইন্দ্রনাথ উত্তর দেন না।

সুপ্রভা সমানে চেঁচিয়ে যেতে থাকেন।

ইন্দ্রনাথ কিন্তু স্ত্রী ছেলেমেয়েদের আপত্তি বিরক্তি বা অসন্তোষ একেবারেই গ্রাহ্য করলেন না। নিয়মিত সুনির্মলের কাছে মালতীর খোঁজখবর নিতে লাগলেন।

এগারো

বিপাশার বৌভাতের পরের দিন সন্ধেবেলায় স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং পুত্রবধূদের নিয়ে দোতলার হল-ঘরে পারিবারিক সভা বসালেন ইন্দ্রনাথ। বিপাশাকে অবশ্য আলিপুর থেকে আনা হয় নি। সবে তার কাল বৌভাত হয়েছে, গায়ে টাটকা নতুন বিয়ের গন্ধ। এই অবস্থায় আজই তাকে ডেকে পাঠানোটা খারাপ দেখায়। ইন্দ্রনাথ মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন, সবার সঙ্গে আলোচনা করে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, পরে বিপাশাকে জানিয়ে দেবেন। তাঁর ধারণা সে তা মেনে নেবে, কোনোরকম আপত্তি করবে না।

ইন্দ্রনাথের সামনে চার পাঁচটি সোফায় শিরদাঁড়া টান টান করে সবাই বসে আছে। তিনি কী বলবেন, কী উদ্দেশ্যে সকলকে তিনি এখানে জড়ো করেছেন, সেটা আন্দাজ করতে না পেরে ছেলেমেয়েরা যেমন উৎকণ্ঠিত তেমনি কৌতূহলীও।

হল-ঘরের সবগুলো আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল বংশী। ধীরে ধীরে সকলকে একবার দেখে নিলেন ইন্দ্রনাথ। তারপর বললেন, 'তোমাদের যে আজ এখানে ডেকেছি তার পেছনে একটা খুব জরুরি কারণ আছে। তোমরা আর কখনও দেশে ফিরবে কিনা, আর কোনোদিন তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে কিনা, সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই। অথচ তোমাদের একসঙ্গে পাওয়াটা একান্ত প্রয়োজন। ছোট খুকির বিয়ে উপলক্ষে যখন এসেই পড়েছ, এই সুযোগটা আমি কাজে লাগাতে চাই।'

ছেলেমেয়েরা যে আর কলকাতায় ফিরবে না, এই সংশয়ের কথা আগেও একবার তাদের বলেছিলেন ইন্দ্রনাথ। তারা তীব্র আপত্তিও জানিয়েছে। বলেছে তাঁর সন্দেহটা নেহাতই অমূলক, যখনই ডাকবেন তখনই তারা কলকাতায় হাজির হবে। আজ কিন্তু কেউ টু শব্দটি করল না, পলকহীন তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

ইন্দ্রনাথ থামেন নি, শান্ত ধীর স্বরে বলতে লাগলেন, 'তোমাদের সেদিন বলেছিলাম, একটা বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। পরে ভেবে দেখলাম বিষয়—একটা নয়, দুটো। এবং দুটোই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।'

এবারও কেউ উত্তর দিল না।

ইন্দ্রনাথ বললেন, 'তোমরা দশ দিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছ। আজ এইট্থ ডে। হাতে আর দুটো দিন [illegible] ফিরে যাবে। তার আগেই কর্তব্য শেষ করে ফেলতে চাই।'

সবার পক্ষ থেকে সুপ্রভা এবার বলে উঠলেন, 'কিসের কর্তব্য?'

ইন্দ্রনাথ বললেন, 'বলছি। আমার বয়েস এখন পঁয়ষট্টি। স্বাস্থ্য বেশ ভালই আছে। মুখার্জি বংশের লোকজন অনেকদিন বাঁচে। তাদের অ্যাভারেজ আয়ু পঁচাত্তর থেকে আশি। তবে এটা তো ঠিক, জীবনের ম্যারাথন দৌড় একরকম শেষ করে এনেছি। মৃত্যুর কথা কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না। বাবা-ঠাকুরদা বেশিদিন বেঁচেছেন বলে আমিও বাঁচব তার গ্যারান্টি নেই। তাই আমাদের এই 'মুখার্জি সদন', অন্য সব স্থাবর সম্পত্তি, টাকাপয়সার ব্যবস্থা মৃত্যুর আগেই করে ফেলতে চাই। নইলে এসব নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হবে।'

একটানা কথাগুলো বলার পর কিছুক্ষণ থামেন ইন্দ্রনাথ। তারপর ফের শুরু করেন, 'আমাদের যা যা আছে সব একটা খাতায় লিখে রেখেছি। শেয়ারের কাগজ, ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিট, এন এস সি আর ইউনিট ট্রাস্টের নানা ডকুমেন্ট আর কয়েক পুরুষের অর্নামেন্ট রয়েছে ছ'টা ব্যাঙ্কের লকারে। লকারের নম্বরগুলো খাতায় লেখা আছে। এখন তোমরা বল প্রোপার্টি, টাকা পয়সা কিভাবে ভাগ করা হবে?'

অশোকই প্রথম মুখ খোলে, 'তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে। ভাগাভাগির

ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই।'

অন্য সবাইও একই কথা বলে। ইন্দ্রনাথ যাকে যা দেবেন তারা তাই মেনে নেবে। তাদের বিশ্বাস বাবার কারো প্রতিই বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নেই, নিরপেক্ষভাবে সব সন্তানকেই বিষয় সম্পত্তি ভাগ করে দেবেন।

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'ভাল কথা। টাকাপয়সা, অর্নামেন্ট, এসব নিয়ে সমস্যা নেই। উইলে কে কী পাবে পরিষ্কার করে লেখা থাকবে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে 'মুখার্জি সদন' নিয়ে।'

সুপ্রভা জিজ্ঞেস করেন, 'কিসের প্রবলেম?'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'এ বাড়ির ভবিষ্যৎ কী? তোমরা কেউ থাকো অস্ট্রেলিয়ায়, কেউ আমেরিকায়, কেউ কানাডায়, কেউ ব্রিটেনে। অশোক তো আমেরিকান ন্যাশানিলিটি পেয়ে গেছে। অন্যরাও কানাডা টানাডার ন্যাশানালিটি পেতে চলেছে। তোমরা দেশে এসে না থাকলে এ বাড়ির অবস্থা কী দাঁড়াবে?'

সবাই অস্বস্তি বোধ করতে থাকে কিন্তু কিছু বলে না। অনেকক্ষণ পর সুপ্রভা দ্বিধান্বিতভাবে বলেন, 'একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না?'

'আগে তো বল। তারপর মনে করাকরির কথা।' স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন ইন্দ্রনাথ।

সুপ্রভা ঢোক গিলে বললেন, 'দেবকুমারবাবু, মানে আমাদের বেয়াই সেদিন তোমাকে আমেরিকায় চলে যেতে বললেন। মেজ খোকা, ছোট খোকা, বড় খুকিরাও তো আমেরিকায় চলে আসতে চাইছে। তুমি গেলে শেষ বয়সটা সবাই মিলে আনন্দে কেটে যাবে।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'দেবকুমারবাবুর কথা আমরা মনে আছে। তোমাদের কী ইচ্ছা সেটা বল।'

সুপ্রভা একটু চিন্তা করে বলেন, 'বেয়াই তো ভাল পরামর্শই দিয়েছেন।'

'তার মানে তোমরাও চাও আমি আমেরিকা চলে যাই। তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'দেশ ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছা আমার একেবারেই নেই। ধর, তোমাদের প্রেসারে চলেই গেলাম। তখন আমাদের পূর্বপুরুষদের এই বাড়িটার কী ব্যবস্থা করে যাব?'

সবাই কিছু বলার জন্য মুখ খোলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলে না।

স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের লক্ষ করতে করতে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'খুব সিম্পল সলিউশান একটা আছে। বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়া যেতে পারে। প্রোমোটাররা বাক্স বাক্স কারেন্সি নোট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কলকাতার এই প্রাইম লোকালিটিতে দু

বিঘের মতো জায়গা, এত বিরাট বিল্ডিং, বাড়িতে যে সব ইতালিয়ান পাথর, বার্মা টিক লাগানো রয়েছে, এই বাজারে সব মিলিয়ে কত দাম তা ভাবই যায় না। তা ছাড়া এত মেহগনির আসবাব—'

তাঁর কথার মাঝখানে অমিত হঠাৎ বলে ওঠে, 'বাড়ি জমি টমি মিলিয়ে কিরকম দাম পাওয়া যাবে বাবা?'

চমকে মেজ ছেলের দিকে তাকান ইন্দ্রনাথ। পূর্বপুরুষদের এই প্রাসাদ যেখানে তাঁদের বংশের শিকড় কয়েক প্রজন্ম ধরে ছড়িয়ে আছে সে সম্বন্ধে মোহ, আগ্রহ বা আবেগ নেই তাঁর ছেলেমেয়েদের। 'মুখার্জি-সদন' শুধু একটা বাড়িই না, ভারতীয় রেনেসাঁসের ইতিহাস আর গৌরব এর অলিন্দে, খিলানে, প্রতিটি কোণে কোণে জড়িয়ে আছে। যে বাড়িকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ হিসেবে সংরক্ষণ করা দরকার, দেখা যাচ্ছে সেটা প্রোমোটারের কাছে বিক্রি করে দিলে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই অমিতদের। টাকাটাই এদের কাছে সব।

ভেতরে ভেতরে চাপা যন্ত্রণা হতে থাকে ইন্দ্রনাথের। অমিতের চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'মিনিমাম সাত আট কোটি।'

এর মধ্যে কম্পিউটারের দক্ষতায় মনে মনে হিসেব কষে ফেলেছে অঞ্জনা। সে বলে, 'তার মানে আমরা ভাইবোনেরা পার হেড মিনিমাম এই বাড়িটা থেকে দেড় কোটি করে পাব।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'তা ছাড়া টাকাকড়ি সোনাদানা যা আছে সে সব থেকেও এক এক জন ষাট সত্তর লাখ টাকা কি তারও বেশি পেতে পার।' বলে লক্ষ করলেন তাঁর প্রতিটি সন্তানের চোখমুখ লোভে চকচক করছে।

একটু চুপচাপ।

তারপর ইন্দ্রনাথ ফের এভাবে শুরু করেন, 'তবে একটা কথা শুনে রাখো, টাকা-পয়সা সব তোমাদের দেবো কিন্তু এটা শুধু ইট কাঠের বিল্ডিং নয়, ন্যাশানাল হিস্ট্রির গ্লোরিয়াস একটা অধ্যায়ের সাক্ষী। এর সম্বন্ধে তোমাদের শ্রদ্ধা না থাকতে পারে, আমার রয়েছে। আমি যতদিন বেঁচে আছি এখানেই কাটাব, ইওরোপ আমেরিকায় যাবার এতটুকু বাসনা আমার নেই। আমার মৃত্যুর পর 'মুখার্জি সদন'কে কিভাবে প্রিজার্ভ করা যায় এখনও ভবি নি, আশা করি একটা উপায় বেরিয়ে যাবে।'

কেউ কোনো সাড়াশব্দ করে না। বাবাকে তারা ভালই চেনে। তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেখান থেকে তাঁকে এতটুকু টলানো যে যাবে না সে সম্বন্ধে তারা নিশ্চিত।

ইন্দ্রনাথ এবার বলেন, 'দ্বিতীয় যে বিষয়টা নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই সেটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।'

ছেলেমেয়েরা উন্মুখ হয়ে তাদের বাবার দিকে তাকায়।

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'সেদিন বনি আর রিখির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ওরা যা বললে তা আমি চিন্তাও করতে পারি না। এরা কারা? আমাদের বংশের রক্ত এদের শরীরে বইছে, ভাবতেও মাথা কাটা যায়।' ইন্দ্রনাথের যে মুখ সারাক্ষণ প্রশান্তিতে ভরে থাকে সেটা ক্রমশ কঠোর হয়ে ওঠে।

অশোক অমিত অঞ্জনারা হকচকিয়ে যায়। একসঙ্গে বলে ওঠে, 'কী হয়েছে বাবা? কী বলেছে বনি আর রিখি?'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'ওদের নাকি একটা করে বয়ফ্রেন্ড আছে। মাঝে মাঝে পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে দু-একদিনের জন্যে উইক-এন্ড কাটাতে কান্ট্রিসাইডে কি সি- বিচে চলে যায়। শুনে আমি থ হয়ে গেছি। মুখার্জি বংশের সুনাম, ট্রাডিশান এরা রসাতলে ডুবিয়ে দিচ্ছে। তোমরা নিজের নিজের মেয়ের এ সব খবর কি রাখো?'

ইন্দ্রনাথের কথাবার্তার ধরন এমনই আক্রমণাত্মক যে অশোকরা চোখ নামিয়ে বসে থাকে। মুখ খুলতে কারো সাহস হয় না।

ঢোক গিলে সুপ্রভা শুধু কোনোরকমে বললেন, 'ওদেশে এসব নিয়ম। এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।'

'আমি ঘামাই। মুখার্জি বংশের মেয়ে হয়ে বেলেল্লাপনা করে বেড়াবে, এটা আমরা পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।' ইন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর এবার কর্কশ শোনায়। চাপ রাগ এবং উত্তেজনা আগুনের ফুলকির মতো তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে।

সুপ্রভা স্বামীকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'দেখ, তুমি এই কলকাতা শহরে পুরনো ধ্যানধারণা নিয়ে পড়ে আছ। বাইরে কোথাও তো বেরুলে না, কোনো খবরও রাখো না। পৃথিবী অনেক বদলে গেছে।'

'বদলাক।' বলে অঞ্জনা আর অশোকের দিকে তাকান ইন্দ্রনাথ, 'পারমিসিভ নোংরা সোসাইটিতে থেকে থেকে মেয়েদের গোল্লায় না পাঠিয়ে দেশে ফিরে আসা যায় কিনা সেটা ভাল করে ভেবে দেখ। এখানে এলে তোমাদের টাকার অভাব হবে না। পায়ের ওপর পা তুলে কিছু না করেও জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে।'

ছেলেমেয়েদের মুখ থেকে টু শব্দটি বেরোয় না। চোখমুখ দেখে মনে হয়, বাবার এই কথাগুলো তাদের একেবারেই পছন্দ নয়।

প্রবল উত্তেজিত ভঙ্গিতে আঙুল তুলে কণ্ঠস্বর অনেকখানি চড়িয়ে ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞস করেন, 'বল, তোমাদের কত টাকা দরকার, বল—'

অশোক অমিতরা এবারও চুপ।

হঠাৎ অসীম নৈরাশ্য চারদিক থেকে ইন্দ্রনাথকে যেন ঘিরে ধরে। দু হাতে মুখ ঢেকে ভাঙাচোরা বিধ্বস্ত মানুষের মতো বহুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ান। ছেলেমেয়েদের একবার ভাল করে লক্ষ করেন। মুখার্জি বংশের রক্তস্রোত এদের ধমনীতে বয়ে চলেছে, তা ভাবতেও কষ্ট হয়।

রাতে একসঙ্গে সবাই খেতে বসেন ঠিকই, কিন্তু কেউ বিশেষ কথাটথা বলে না। সন্ধেবেলায় সেই পারিবারিক সভার পর থেকেই এ বাড়ির আবহাওয়া ভারি হয়ে উঠেছে। সকলেই চুপচাপ। কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছে না। সব মিলিয়ে 'মুখার্জি সদন' জুড়ে কেমন যেন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য ভর করেছে।

খেতে খেতে ছেলেমেয়েদের উদ্দেশে হঠাৎ ইন্দ্রনাথ বলেন, 'আমি যা বলেছি ভাল করে সেটা ভেবে দেখো। প্রয়োজন যখন নেই, কেন জন্মভূমি ছেড়ে দূর দেশে পড়ে থাকবে?' এবার তাঁর গলার স্বর অনেক নরম এবং আর্দ্র।

কেউ সাড়া দেয় না।

বিশাল ডাইনিং টেবলের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ধীরে ধীরে সবাইকে একবার দেখে নেন ইন্দ্রনাথ। তারপর উঠে দাঁড়ান। হল-ঘরের একধারে বেসিন রয়েছে। সেখানে মুখটুখ ধুয়ে সোজা তেতলায় উঠে যান।

চিরকালের অভ্যাসমতো নিজের পড়ার টেবলে এসে কিছুক্ষণ বসে থাকেন ইন্দ্রনাথ। টেবলের ওপর ডাঁই-করা রয়েছে নানা রেফারেন্সের বই। অন্যদিন সেগুলো থেকে বেছে নিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু কিছু অংশ পড়েন। আজ মনটা এমনই বিক্ষিপ্ত আর ভারাক্রান্ত হয়ে আছে যে বইয়ে হাত দিতে ইচ্ছা করল না।

ঘণ্টাখানেক বাদে সুপ্রভা ওপরে উঠে এলেন। তেতলার হল-ঘরের কোণের দিকের বেড-রুমটা তাঁর আর ইন্দ্রনাথের। সেদিকে যেতে যেতে সুপ্রভা বলেন, 'তুমি কি এখন শোবে? নাকি আরো পড়বে?' ইন্দ্রনাথের হাতে যে বইটই নেই, চুপচাপ বসে আছেন, সেটা লক্ষ করেন নি তিনি।

ইন্দ্রনাথ আড়ষ্ট স্বরে কী উত্তর দেন, বোঝা যায় না।

'আমার কিন্তু ভীষণ ঘুম পেয়েছে—'বলতে বলতে কোণের ঘরটিতে গিয়ে একটা জিরো পাওয়ারের নীলাভ বাল্ব জ্বালিয়ে শুয়ে পড়েন সুপ্রভা।

পড়ার টেবল থেকে আবছাভাবে সুপ্রভাকে দেখা যাচ্ছে। আগে, তখনও বিদেশে যান নি তিনি, রাতে খাওয়া দাওয়ার পর এই টেবলে এসে মুখোমুখি বসে অনেকক্ষণ গল্পটল্প করতেন, তারপর দু'জনে একসঙ্গে শুতে যেতেন। সে সব হয়তো মনে নেই সুপ্রভার। চার মহাদেশের চোখধাঁধানো গ্ল্যামার আর দুরন্ত গতির জীবনযাপন পদ্ধতি

তাঁর স্মৃতি থেকে দু বছর আগের পুরনো প্রিয় অভ্যাসগুলোকে বুঝিবা একেবারেই মুছে দিয়েছে। যে মহিলাটির সঙ্গে একচল্লিশ বছরেরও বেশি সময় কেটে গেছে সেই সুপ্রভার সঙ্গে এখনকার এই সুপ্রভার মিল সমান্যই। বুকের কোনো এক অনির্দিষ্ট অংশে অস্পষ্ট একটা কষ্ট অনুভব করতে থাকেন ইন্দ্রনাথ। কিন্তু তারই মধ্যে তীব্র, প্রচণ্ড এক আকর্ষণ ইন্দ্রনাথকে একটানে দাঁড় করিয়ে দেয়, তারপর নিয়তির মতো কোনো অপ্রতিরোধ্য শক্তি তাঁকে ধাক্কা দিতে দিতে শোবার ঘরে নিয়ে যায়।

খাটের কাছে গিয়ে স্বপ্নবৎ নীলাভ আলোয় ঝুঁকে স্ত্রীকে দেখতে থাকেন ইন্দ্রনাথ। সুপ্রভার গলা পর্যন্ত লেপে ঢাকা। শুধু মুখখানাই বাইরে বেরিয়ে আছে। স্বপ্নে-দেখা অপার্থিব কোনো পরীর মুখের মতো মনে হচ্ছে। সুপ্রভার চোখ দুটো বোজা, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। একচল্লিশ বছরের পুরনো স্ত্রীকে দেখতে দেখতে হঠাৎ যৌবনের উন্মাদনা বুকের ভেতর তুমুল আলোড়ন তুলতে থাকে ইন্দ্রনাথের। এই নারী তাঁর কতকালের পরিচিত কিন্তু তবু মনে হয় বড়ই অচেনা আর রহস্যময়ী। আট দিন হলো সুপ্রভা কলকাতায় এসেছেন। প্রথম দু-তিনটে দিন নাতনিদের কাছে শুয়েছেন। তারপর বিশাখার বিয়ে নিয়ে সবাই এত ব্যস্ত ছিল যে কারো অন্য কোনো দিকে তাকাবার ফুরসত ছিল না। অনেক রাতে সুপ্রভা এবং ইন্দ্রনাথ এ ঘরে এসে শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আজই প্রথম এমন নির্জনে স্ত্রীর দিকে ভাল করে তাকানোর সময় হল ইন্দ্রনাথের। ক্রমশ তিনি টের পাচ্ছিলেন নিঃশ্বাস লু-বাতাসের মতো উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন এমনই প্রবল যে তার শব্দ যেন শোনা যাচ্ছে। পঁয়ষট্টি বছরের ঝিমিয়ে আসা রক্তের ভেতর শেষ রতিশক্তিটুকু যেন আগুনের হলকার মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

অন্তহীন এক ঘোরের মধ্যে লেপের তলায় চলে আসেন ইন্দ্রনাথ। বিপুল আবেগে স্ত্রীর মুখে ঠোঁট নামিয়ে চুমু খান। ঘুমের ঘোরে সুপ্রভার জড়িত কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'কে—'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'আমি—আমি। তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না প্রভা, আমাকে ছেড়ে চলে যেও না।' তাঁর গলা ভীষণ কাঁপতে থাকে।

সুপ্রভার সাড়া পাওয়া যায় না। তবে ঘুমের মধ্যেই তিনি টের পান তাঁর শরীরের ওপর আরেকটি শরীর উঠে আসছে এবং দু'টি হাত তার গলা জড়িয়ে ধরেছে।

এবার ঘুমটা ভেঙে যায় সুপ্রভার। ধাক্কা দিয়ে ইন্দ্রনাথকে নামিয়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ চাপা গলায় বলেন, 'বুড়ো বয়সে—ছিঃ—' বলে পাশ ফিরে আড় হয়ে শুয়ে থাকেন।

ছিঃ শব্দটা মুহূর্তে ছুরির ফলার মতো আমূল গেঁথে যায় ইন্দ্রনাথের মস্তিষ্কে। স্ত্রীর ধিক্কার তাঁকে বেশ কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে। তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে নিজেকে

গুটিয়ে নিতে নিতে চকিতের জন্য মনে হয়, সুপ্রভার শরীরের যাবতীয় বোধগুলি কি একবারেই নষ্ট হয়ে গেছে? স্ত্রীর পাশাপাশি একই বিছানায় একই লেপের তলায় শুয়ে লজ্জায় এবং গ্লানিতে তাঁর মাথা কাটা যেতে লাগল। তার সম্বন্ধে কী ভাবল সুপ্রভা? যৌনক্ষুধাতুর বৃদ্ধ লম্পট? স্ত্রীর দেহমনের স্বত্বাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মনে হলো তিনি যেন সব কিছু খুইয়ে বসেছেন।

বারো

সেই যে এক শুক্রবার ইন্দ্রনাথকে দারুণ চমক দিয়ে ছেলেমেয়ে পুত্রবধূ জামাই এবং নাতিনাতনিরা কলকাতায় এসেছিল, ঠিক দশ দিন বাদে তারা আবার পৃথিবীর নানা মহাদেশে ফিরে গেল। সুপ্রভা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, ওদের সঙ্গে যাবেন। ছোট মেয়ের নতুন সংসার গুছিয়ে দেবার জন্য তিনিও নিউ ইয়র্ক চলে গেলেন।

যাবার আগে হয়তো কিঞ্চিৎ করুণাই হয়ে থাকবে সুপ্রভার। নির্জনে ইন্দ্রনাথকে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, 'কিছু ভেবো না, তিনমাস বাদে ফিরে আসব।'

ইন্দ্রনাথ উত্তর দেন নি।

মনে আছে, সেদিনের পারিবারিক সভার পর দুটো দিন ছেলেমেয়েরা কেউ ইন্দ্রনাথের সঙ্গে ভাল করে কথা বলেনি। সবাই এক প্রাচীনপন্থী, পিউরিটান, শুচিবাইগ্রস্ত, বয়স্ক মানুষের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত। তিনি তাঁর পুরনো অনমনীয় ধ্যানধারণা এবং বংশগৌরব যক্ষের মতো আগলে কলকাতা নামে এক কুয়োর বদ্ধ জলায় বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিন—সবার ভাবখানা এইরকম।

এত বড় 'মুখার্জি সদন'-এ ইন্দ্রনাথ ফের একেবারে একা হয়ে যান। বিপাশার বিয়ের ব্যাপারে এ ক'দিন এমন ব্যস্ততা এবং উত্তেজনার মধ্যে ছিলেন যে দিনে দু-তিন বার ফোন করে খবর নেওয়া ছাড়া মালতীর দিকে সেভাবে মনোযোগ দিতে পারেন নি। এখন তিনি অনেকটাই চাপমুক্ত। আজ তিনি স্থির করলেন, হাসপাতালে মেয়েটাকে দেখতে যাবেন। হঠাৎ একটা ব্যাপার খেয়াল হতে বিষাদে মন ভরে যায় তাঁর। অশোক শুভময় বা সুপ্রভাদের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল, কিন্তু বিপাশা? যে মেয়েটা নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে তার সম্ভ্রম বাঁচিয়েছে তাকে কি একবার দেখে যেতে পারত না? সামান্য কৃতজ্ঞতাবোধও কি মানুষের থাকতে নেই?

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর সুনির্মলকে ফোন করেন ইন্দ্রনাথ, 'মালতী এখন কেমন আছে?' সুনির্মলকে ফোন করলে প্রথমেই এই প্রশ্নটা দিয়ে কথোপকথন শুরু

করেন তিনি।

সুনির্মল বলে, 'অনেকটা ভাল আছে স্যার! মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে, এখন এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।'

'আমি ওকে আজ দেখতে যাব হাসপাতালে! অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল। তুমি তো জানোই, মেয়ের বিয়ের জন্যে—'

ইন্দ্রনাথের কথা শেষ হবার আগে সুনির্মল বলে ওঠে, 'কিন্তু স্যার—'

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কিন্তু কী?'

সুনির্মল বলে, 'আপনার যাওয়ার কি খুব দরকার আছে? মানে মালতী তো মোটমুটি সুস্থই হয়ে গেছে। আপনার কিছু বলার থাকলে আমাকে বলুন। ওকে জানিয়ে দেব।'

সুনির্মলের মনোভাবটা বুঝতে পারছিলেন ইন্দ্রনাথ। মালতী যে স্তরের মেয়ে তার কাছে তাঁরা মতো একজন সম্মানিত, শ্রদ্ধেয় মানুষের যাওয়া ঠিক নয়। ইন্দ্রনাথ গম্ভীর স্বরে বলেন, 'ওর সঙ্গে দেখা করাটা আমার কর্তব্য। আমি ঠিক চারটেয় হাসপাতালে যাচ্ছি। তোমার কি ওই সময় অন্য কোনো অ্যাসাইনমেন্ট আছে?'

'না।'

'তা হলে হাসপাতালে আসতে পারবে কি?'

'পারব স্যার।'

হাসপাতালে আসতে দেখা গেল সুনির্মল গেটের সামনে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। ইন্দ্রনাথ গাড়ি থেকে নামতেই বলে, 'আসুন স্যার।' সে তাঁকে সঙ্গে করে লিফটের দিকে চলে যায়।

মালতী এখন আর ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নেই। দিন তিনেক আগে তাকে একটা কেবিনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

লিফটে করে চারতলায় উঠে সুনির্মলের সঙ্গে মালতীর কেবিনে চলে আসেন ইন্দ্রনাথ।

যে স্টিলের খাটটিতে মালতী শুয়ে ছিল সেটার মাথার দিক সামান্য উঁচুতে তোলা। তার সমস্ত শরীর ধবধবে ওয়াড় লাগানো কম্বলে ঢাকা, শুধু মুখটাই বেরিয়ে আছে। প্রচুর রক্তপাতের কারণে সে মুখ কাগজের মতো সাদা। অঢেল কালো চুল আঁচড়ে দুটো লম্বা বেণী করে মুখের দু পাশ দিয়ে কম্বলের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে। খুব সম্ভব এটা নার্সদের কারো কাজ। সুনির্মলের কাছে খবর নিয়ে ইন্দ্রনাথ জেনেছেন হাত পা নাড়ার শক্তি নেই মালতীর। গলার নিচে থেকে উরু পর্যন্ত প্রায়

গোটা শরীরে তার পুরু ব্যান্ডেজ। নিজের হাতে বেণী বাঁধবে কী করে?

পায়ের শব্দে মুখটা ডান পাশে সামান্য ফিরিয়ে নির্জীব চোখে তাকায় মালতী। তার বেডের কাছে এসে সুনির্মল ইন্দ্রনাথকে দেখিয়ে বলে, 'দেখ, আজ আমার সঙ্গে কে এসেছেন। চিনতে পারছ?'

ইন্দ্রনাথকে আগেই লক্ষ করেছিল মালতী। একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয়। ফিস ফিস করে বলে, 'পেরেছি। সেদিন রাত্তিরে কুয়াশা আর আঁধারে ময়দানে দেখেছিলাম। তবু মনে আছে।'

মেয়েটাকে দেখতে দেখতে বুকের ভেতর চাপ অনুভব করছিলেন ইন্দ্রনাথ। পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মানুষের আবেগ অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। তবু যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাতে টের পাওয়া যাচ্ছিল গলার কাছটা ভারি হয়ে উঠেছে। কণ্ঠস্বর কোনোরকমে মুক্ত করে তিনি বলেন, 'আমাদের জন্যে তোমার প্রাণটা যেতে বসেছিল মালতী। তুমি বেঁচে না উঠলে চিরকালের মতো আক্ষেপ থেকে যেত আমার।'

মালতীর মুখে ফ্যাকাশে একটু হাসি ফুটে ওঠে। দুর্বল গলায় বলে, 'ও কিছু না। আমি নরকের পোকা, মরে গেলেও কারো যায় আসে না। মৃত্যু যদি হতোই, ভাবতাম একটা ভাল কাজ করে অন্তত মরেছি।'

পরের জন্য অকাতরে জীবনদান করাটা মালতীর কাছে একটা মহৎ কর্তব্য। তার মুখ থেকে এই কথাগুলো শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে যান ইন্দ্রনাথ।

মালতী থামে নি। সুনির্মলকে দেখিয়ে বলে, 'এই পুলিশ সাহেবের কাছে শুনেছি আপনি খুব পণ্ডিত লোক! আর ওই দিদি, মানে আপনার মেয়ে কী সুন্দর দেখতে, বিলেত-আমেরিকায় থাকে। আপনাদের ক্ষতি হলে সেটা দেশের ক্ষতি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর সুনির্মল বলে, 'এই স্যার বলেছেন, এখন থেকে তোমার যা যা দরকার হবে, সব ব্যবস্থা উনি করবেন।'

মালতী কৃতজ্ঞ সুরে বলে, 'সেটা ওঁর দয়া। কিন্তু—'

'কী?'

'আমার মতো একটা নোংরা পোকার কথা উনি এত ভাবছেন কেন? এতখানি সম্মান আমার পাওয়ার কথা নয়।'

ইন্দ্রনাথ কিছু ভাবছিলেন। এবার বলেন, 'সুনির্মলের কাছে শুনেছি, তোমার কেউ নেই।'

মালতী আস্তে মাথা নাড়ে, 'না। আমাদের কেউ থাকে না।'

ঠিক এই কথাগুলোই ক'দিন আগে সুনির্মল ইন্দ্রনাথকে জানিয়েছে। তিনি

জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি থাকো কোথায়?'

মালতীর মুখে মলিন হাসি ফোটে। সে বলে, 'নরকের পোকারা আর কোথায় থাকে?—নরকেই।'

ইন্দ্রনাথ হকচকিয়ে যান। কী বলবেন ভেবে পান না। মালতীর স্পষ্টাস্পষ্টি কথায় ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। হঠাৎ মালতী জিজ্ঞেস করে, 'আমার ঠিকানা জানতে চাইছেন কেন বাবু?'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিলে তুমি সেখানেই ফিরে যাবে কিনা—' বলতে বলতে চুপ করে যান।

কী একটু চিন্তা করে মালতী। তারপর দ্বিধান্বিতভাবে বলে, 'ফিরে হয়তো যাব। তবে—'

'তবে কী?'

'এখনই তা বলতে পারছি না। আগে তো হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাই।'

ইন্দ্রনাথ এবার বলেন, 'অনেকক্ষণ কথা বলছ, আর নয়। এখন বিশ্রাম কর। আমরা চলি।' একটু থেমে বলেন, 'দু-একদিন পর আবার তোমাকে দেখতে আসব।'

মালতী বলে, 'দয়া করে আসবেন না।'

'কেন?'

'আমার মতো বাজে মেয়েমানুষের কাছে বার বার আপনার আসা ঠিক নয়। লোকে খারাপ ভাববে।'

প্রথমটা চমকে ওঠেন ইন্দ্রনাথ। পরক্ষণে তাঁর মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। বলেন, 'কে কী বলল তা নিয়ে ভাবি না। তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠ।'

মালতী উত্তর দেয় না।

কেবিন থেকে বেরিয়ে সামনের করিডর দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'মালতীকে আর কতদিন হাসপাতালে থাকতে হবে?'

সুনির্মল বলেন, 'বলতে পারব না স্যার। ডাক্তার বাসুকে জিজ্ঞেস করলে জানা যেতে পারে।'

'ডাক্তার বাসু কে?'

'মালতী যাঁর চার্জে রয়েছে।'

'ওঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে?'

সুনির্মল বলে, 'পারে। বিকেলের দিকে পেশেন্ট দেখতে আসেন। খোঁজ নেব?'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'নাও তো।'

'স্যার, আপনি এখানে একটু দাঁড়ান। আমি ওঁর চেম্বারে দেখে আসছি।'

প্যাসেজটা সামনের দিকে খানিকটা এগিয়ে ডাইনে এবং বাঁয়ে দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। সুনির্মল বাঁ পাশের প্যাসেজ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ইন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে থাকেন।

এখন, এই ভিজিটিং আওয়ার্সে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্রচুর ভিড়। পেশেন্টদের আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবরা দেখা করতে এসেছে।

মিনিট পাঁচেক পর ফিরে এসে সুনির্মল বলে, 'ডাক্তার বাসু আছেন স্যার। আসুন—'

'চল।'

সুনির্মল ইন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে বড় একটা চেম্বারে যে ডাক্তারটির কাছে আসে তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পাতলা, মেদহীন চেহারা, চোখেমুখে আত্মবিশ্বাসের ছাপ। হাতজোড় করে সসম্ভ্রমে ইন্দ্রনাথকে বলেন, 'বসুন স্যার। এই পুলিশ অফিসার আপনার সম্বন্ধে আমাকে সবই জানিয়েছেন।'

ইন্দ্রনাথ অল্প হাসেন।

ডাক্তার বাসু এবার বলেন, 'মালতী নামে ওই স্ট্রিট ওয়াকারটি আপনাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে—সেটা ঠিক। তবে তাদের দেখতে কেউ আপনার মতো ছুটে আসে না, এড়িয়েই চলতে চায়।' একটু থেমে বলেন, 'আপনার ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল স্যার। এখন বলুন, আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'সুনির্মলের কাছে শুনেছি, আপনি ওকে খুব যত্ন করে চিকিৎসা করছেন।'

'ওটা তো আমার ডিউটি স্যার।' ডাক্তার বাসু মৃদু হাসেন।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'মেয়েটা আবার আগের মতো সুস্থ হয়ে উঠবে তো?'

ডাক্তার বাসু একটু ভেবে বলেন, 'যেভাবে স্ট্যাব করা হয়েছে তাতে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া মুশকিল।'

উদ্বিগ্ন মুখে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'ওর যা নরম্যাল লাইফ তা লিড করা সম্ভব হবে কি?'

ইন্দ্রনাথের প্রশ্নটার মধ্যে একটা ইঙ্গিত দিল। সেটা নিজের মতো করে বুঝে নিলেন ডাক্তার বাসু। বললেন, 'নরম্যাল লাইফ বলতে আপনি কী মনে করছেন, বুঝতে পারছি। ওর যা প্রোফেসান সেটা চালানো একেবারেই ইমপসিবল।'

যা বলার স্পষ্ট করেই বলেছেন ডাক্তার বাসু। তবে সেটা জানতে চান নি ইন্দ্রনাথ। এমন একটা সম্ভাবনার কথা তাঁর মাথাতেও ছিল না। তাঁর জানার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সুস্থ শরীরে মালতী আদৌ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে কিনা। প্রোফেসানের কথাটা তিনি ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করেন নি। এটা একটা নতুন সমস্যা বটে।

কিন্তু এ ভাবনাটা পরে ভাবলেও চলবে। আপাতত মালতী সুস্থ হয়ে উঠুক।

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'আর কতদিন ওকে হাসপাতালে থাকতে হবে?'

ডাক্তার বাসু বলেন, 'বেশিদিন নয়। আপনি হয়তো জানেন হাসপাতালের বেড আর কেবিনের জন্যে লোক 'কিউ' দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাত আট দিন পর মালতী একটু দাঁড়াতে পারলেই ওকে রিলিজ করে দেব।'

ইন্দ্রনাথের মাথায় বিদ্যুৎচমকের মতো নানা ভাবনার ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এর মধ্যেই তিনি জেনে গেছেন, মালতীর কেউ নেই। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে সে কোথায় থাকবে, কী খাবে, কে তার দেখাশোনা করবে, এ সব সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণাই নেই। তাঁদের জন্য শেষ পর্যন্ত মেয়েটার কি মৃত্যু ঘটবে?

ইন্দ্রনাথকে ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত দেখায়। বলেন, 'আপনারা যেভাবে ওকে রিলিজ করে দিতে চাইছেন তাতে একটা রিস্ক থেকে যাচ্ছে না?'

'কিসের রিস্ক?'

'হাসপাতালের মতো কেয়ার, ওষুধ, পথ্য তো বাইরে পাবে না। ফের যদি—'

ইন্দ্রনাথকে থামিয়ে দিয়ে ডাক্তার বাসু বলেন, 'আপনি কী বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনাকে তো আগেই বলেছি, প্রচুর পেশেন্ট ওয়েটিং লিস্টে রয়েছে। আমার কিছু করণীয় নেই। তবে হাসপাতাল থেকে চলে যাবার পর মেয়েটার যদি কোনো কমপ্লিকেশান দেখা দেয়, আমার কাছে এলে ওষুধের ব্যবস্থা করে দেবো। এর জন্যে ওকে দামটাম দিতে হবে না।'

ইন্দ্রনাথ একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'আচ্ছা, একটা কাজ কি করা যেতে পারে?'

ডাক্তার বাসু উৎসুক সুরে জিজ্ঞেস করেন, 'কী কাজ?'

'আমি যদি মালতীকে কলকাতার একটা ভাল নার্সিং হোমে রাখি, মানে যতদিন না হেঁটে চলে বেড়াবার মতো সুস্থ হয়ে ওঠে—'

'ঋণ শোধ করতে চাইছেন?'

'এভাবে ক'টা টাকা খরচ করে ওর ঋণ শোধ করা যাবে ডাক্তার বাসু?'

বিব্রতভাবে ডাক্তার বাসু বলেন, 'না না, আমি ওভাবে কথাটা বলি নি। নার্সিং হোমে থাকলে ওর পক্ষে খুবই ভাল হবে।'

ইন্দ্রনাথ আর কিছু বলেন না। সুনির্মলের সঙ্গে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ কী মনে পড়ে যাওয়ায় জিজ্ঞেস করেন, 'একটা খবর এখনও জানা হয় নি।'

সুনির্মল বলে, 'কী খবর স্যার?'

'যারা সেদিন রাত্তিরে মালতীর ওপর হামলা করেছিল, সেই হুলিগানগুলো কি ধরা পড়েছে?'

'না স্যার। তবে ওরা দাগী ক্রিমিন্যাল, বেশি দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে না। ধরা ওদের পড়তেই হবে। ওনলি আ ম্যাটার অফ ডেজ।'

তেরো

আরো কয়েক দিন কেটে যায়।

বিপাশার বিয়ের কারণে মাঝখানে কিছুদিন পুরনো রুটিন আর পুরনো অভ্যাসে কিছুটা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। আবার সেগুলো আগের নিয়মে চালু হয়ে গেছে। পাঁচ বন্ধুর সঙ্গে দেড় ঘণ্টার প্রাতঃভ্রমণ, রোজ সকালে আড়াই মিনিট করে ছেলেমেয়েদের ফোন, পড়াশোনা, লেখা ইত্যাদি সমস্তই যান্ত্রিক নিয়মে চলছে।

এতদিন ভ্রমণসঙ্গীদের রোজকার আলোচনার বিষয় ছিল ব্যাঙ্ক বা ইউনিট ট্রাস্টের ইন্টারেস্ট, নানা কোম্পানির ডিভিডেন্ড, অসুখ বিসুখ নিয়ে দুশ্চিন্তা, বেলেঘাটার অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন গুরু—এই সব। ইদানীং তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বিপাশার বিয়ে।

ইন্দ্রনাথের বন্ধুদের পারিবারিক বা বংশগত ব্যাকগ্রাউন্ড তেমন উজ্জ্বল নয়। মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি থেকে তাঁরা এসেছেন। সবাই অবশ্য অত্যন্ত সুশিক্ষিত, কৃতী এবং সফল মানুষ। কিন্তু বাবা ঠাকুরদা নেহাতই সাধারণ। কেউ ছিলেন মার্চেন্ট অফিসের বড় বাবু বা ছোটখাট গভর্নমেন্ট অফিসার। ইন্দ্রনাথদের দেড়শ বছরের চোখ-ধাঁধানো আভিজাত্যের বিন্দুমাত্র তাঁদের ছিল না।

বন্ধুরা রোজই বলেন, 'বিয়ে একটা দেখলাম বটে। তোমরা হলে লাস্ট অফ দা নাইনটিনথ সেঞ্চুরি অ্যারিস্টোক্রাটস। পুরনো বনেদিআনা কাকে বলে, তোমার ছোট মেয়ের বিয়েতে না গেলে জানাই হতো না।'

ইন্দ্রনাথ লজ্জা পান। কুণ্ঠিতভাবে বলেন, 'আমাদের মতো বনেদি বংশ আরো অনেক আছে। তাদের বাড়ির বিয়েতে এই রকমই হয়ে থাকে।'

সত্যজিৎ বলেন, 'তোমরা ছাড়া বনেদি পরিবারগুলো কি আর আছে! সব মদ মেয়েমানুষ করেই সর্বস্ব উড়িয়ে দিয়েছে।'

আনন্দগোপাল বলেন, 'মেয়েকে যে জুয়েলারি দিলে আগে জীবনে কখনও দেখি নি।'

ইন্দ্রনাথ তাঁদের থামাবার চেষ্টা করেন কিন্তু বিপাশার বিয়েটা ওঁদের মাথায় ফিক্সেশানের মতো আটকে গেছে। ঘুরে ফিরে ব্যাঙ্ক ইন্টারেস্ট, শেয়ার, ডিভিডেন্ডের মতো এই প্রসঙ্গটা যে আরো কতদিন কতবার আসবে, কে জানে।

একদিন রাজশেখর বললেন, 'মাদাম মুখার্জি তো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে চলে গেলেন। কী ব্যাপার হে —'

অন্য বন্ধুরাও ইন্দ্রনাথকে খোঁচা দিয়ে একটু রগড় করার সুযোগটা ছাড়লেন না। গলা মিলিয়ে কোরাসে বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যাপারটা কী বল তো ভাই।'

সুপ্রভাকে নিয়ে বেশ খানিকটা ক্ষোভ মনের ভেতর জমা হয়ে আছে। তিনি এবার বিদেশে যান, সেটা একেবারেই চান নি ইন্দ্রনাথ। কিন্তু এ নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আগে কোনোরকম আলোচনা করেন নি। দাম্পত্য জীবনের গোপন ব্যাপারগুলি প্রকাশ্য দিবালোকে সবার সামনে টেনে এনে কী লাভ? বিব্রতভাবে তিনি শুধু বলেন, 'না মানে—'

আনন্দগোপাল হেসে হেসে বলেন, 'তোমার সম্বন্ধে মাদাম মুখার্জির অ্যাট্রাকশান কি শেষ হয়ে গেছে? স্ত্রীকে বশ করার মতো 'মোহিনী শক্তি' কি নষ্ট করে ফেলেছ?'

কুণ্ঠিত একটু হাসেন ইন্দ্রনাথ, উত্তর দেন না।

সুপ্রভাকে নিয়ে শেয়ার ডিভিডেন্ড অসুখ বিসুখের পাশাপাশি ভ্রমণসঙ্গীরা ইদানীং নতুন একটা মজা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এর মধ্যে সেই আগের মতো রোজ আড়াই মিনিট করে ফোন করে যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা। নেহাতই নিয়মরক্ষা। এবার কলকাতা থেকে যাবার পর এই ফোন-কলগুলি এতই নীরস আর আবেগহীন যে আন্তরিকতার চিহ্নমাত্র নেই। স্ত্রী আর পুত্রকন্যারা যেন আরো দূরে সরে গেছে, সম্পর্ক যেটুকুও বা অবশিষ্ট ছিল তা আরো শিথিল হয়ে যাচ্ছে। ওরা কথা বললে মানে হয় সুদূর কোনো গ্রহান্তর থেকে অচেনা কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

আজ দুপুরের খাওয়া চুকিয়ে তেতলায় আসতেই সুনির্মলের ফোন এল। সে বলে, 'স্যার, আপনাকে দুটো খবর দেবার আছে।'

ইন্দ্রনাথ উৎসুক হলেন, 'বল।'

'প্রথম খবরটা হলো সেই হুলিগান তিনটে ধরা পড়েছে। কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না যে ময়দানে সেদিন আপনাদের ওপর হামলা করেছে। তারপর ভাল মেডিসিন দিতেই হড় হড় করে কবুল করে ফেলল।' বলে হাসল সুনির্মল।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'মেডিসিন মানে? মারধর করলে নাকি?'

সোজাসুজি উত্তর দিল না সুনির্মল। প্রথমে হাসির শব্দ ভেসে এল তার। তারপর বলল, 'স্যার এই সব দাগী ক্রিমিনালদের কোলে বসিয়ে রাবড়ি খাওয়ালে কি কনফেস করবে?'

স্বীকারোক্তিটা কী পদ্ধতিতে আদায় করা হয়েছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না ইন্দ্রনাথের। তিনি চুপ করে থাকেন।

সুনির্মল এবার বলে, 'স্যার, দ্বিতীয় খবরটা হল হাসপাতাল থেকে আজ বিকেলে মালতীকে ডিসচার্জ করে দেবে।'

ইন্দ্রনাথ চকিত হয়ে ওঠেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেদিন ডক্টর বাসু বলছিলেন বটে, কয়েকদিনের ভেতর ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ও তো এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি।' হঠাৎ কী মনে পড়ে যাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন, 'তোমাকে সেদিন নার্সিং হোমের কথা বলেছিলাম না?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'ঠিক আছে, দেখি কী করা যায়। ঘণ্টাখানেক পর তোমাকে ফোন করছি। এখন রাখলাম।'

এক ঘণ্টার ভেতর সেন্ট্রাল ক্যালকাটার একটা বড় নার্সিং হোমে যোগাযোগ করে মালতীর থাকা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ফেলেন ইন্দ্রনাথ। তারপর সুনির্মলকে ফোন করেন, 'জেনিথ নার্সিং হোমে সব অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে গেছে। তুমি তিনটে নাগদ হাসপাতালে যেতে পারবে?'

সুনির্মল বলে, 'পারব স্যার।'

'আমিও ওই সময় যাচ্ছি। মালতীকে নিয়ে নার্সিং হোমে ভর্তি করে দিয়ে আসব।'

'আচ্ছা স্যার।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'তোমার ওপর বড় বেশি জুলুম করছি সুনির্মল। আমার ভীষণ সঙ্কোচ হচ্ছে।'

সুনির্মল বলে, 'দয়া করে ওভাবে বলবেন না। আপনার কাছাকাছি আসতে পারব, কখনও কি ভাবতে পেরেছিলাম। নেহাত ওই রকম একটা ঘটনা ঘটল, তাই—'

'ঠিক আছে, আই উইদড্র।'

তিনটেয় হাসপাতালে এসে ইন্দ্রনাথ দেখতে পান, গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সুনির্মল। তার সঙ্গে ডাক্তার বাসুর কাছে গিয়ে মালতীকে ডিসচার্জ করিয়ে জেনিথ নার্সিং হোমে ভর্তি করতে সাড়ে চারটে বেজে গেল।

মালতী নার্সিং হোমে যেতে চাইছিল না। বার বার বলছিল, 'কেন আমার জন্যে এত খরচা করছেন?'

সস্নেহে ইন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। এখন তাড়াতাড়ি ভাল হয় ওঠ।'

চোদ্দ

নার্সিং হোমে সপ্তাহ তিনেক কাটাবার পর অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছে মালতী। তবে এখনও ভাল করে উঠে দাঁড়াতে পারে না।

ইন্দ্রনাথ রোজ বিকেলে তাকে দেখতে গেছেন। রোজই মালতী তাঁকে বলেছে, 'আমার এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না। আপনি ডাক্তারবাবুদের বলে ছুটি করিয়ে দিন।'

মালতীর অনিচ্ছার কারণটা বুঝতে অসুবিধা হয় না ইন্দ্রনাথের। ওর জন্য তাঁর টাকা খরচ হচ্ছে, এই চিন্তাটা মেয়েটাকে অস্থির করে রেখেছে। তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, 'এখানে থাকতে তোমার আপত্তি কেন? কেউ তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে?'

'না তো।'

'তবে?'

'আপনি আমার অভ্যেস খারাপ করে দিচ্ছেন।'

'তার মানে?'

'এত আরামে কখনও থাকি নি। এখান থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আবার তো সেই নরকে ফিরে যাব। তখন ভীষণ কষ্ট হবে।'

'কিন্তু তোমার তো পুরোপুরি সুস্থ হওয়া দরকার।'

'যথেষ্ট হয়েছে। আমি যাতে এখান থেকে বেরুতে পারি তার ব্যবস্থা করে দিন।'

মালতী এমনই জোর করতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত ওকে কিছু না জানিয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বললেন ইন্দ্রনাথ। তাঁরা জানালেন, এই অবস্থায় মালতীর আরো দু-দিন সপ্তাহ নার্সিং হোমে থাকা একান্ত দরকার। নিতান্তই যদি তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বেশ কিছুদিন হুইল চেয়ারে ঘোরাফেরা করতে হবে এবং অভিজ্ঞ নার্স দিয়ে হাঁটাবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এভাবে ধীরে ধীরে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

কিন্তু মালতী নার্সিং হোম থেকে বেরুলে যেখানে গিয়ে উঠবে সেই জায়গাটা আদৌ ভাল নয়, তার নিজের কথায় নরক। এসব আগেই শুনেছেন ইন্দ্রনাথ কিন্তু

সে ব্যাপারে তাঁর নিজের পরিষ্কার ধারণা নেই। সেখানে গেলে মেয়েটার পুরোপুরি সুস্থ হওয়া আদৌ সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে তাঁর। অথচ মেয়েটা সম্পূর্ণ রোগমুক্ত এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠুক, এটাই আন্তরিকভাবে চান। তা হলে মালতীর কাছে তাঁর ঋণের খানিকটা অন্তত শোধ হবে।

নার্সিং হোম থেকে মালতী বেরিয়ে এলে তাঁর কী করা উচিত সেটা বুঝে উঠতে পারছিলেন না ইন্দ্রনাথ। খানিকটা দিশেহারাই হয়ে পড়েছিলেন। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে এ বিষয়ে যে পরামর্শ করবেন সেটাও সম্ভব নয়। মালতীর ব্যাপারটা ওঁদের কাছে পুরোপুরি গোপনই রেখেছেন। বন্ধুদের তো তিনি চেনেন, সোসাইটির যে স্তর থেকে মালতী উঠে এসেছে সে প্রসঙ্গ উঠলেই ঘৃণায় তাঁদের নাকমুখ কুঁচকে যাবে। একমাত্র সুনির্মলই ভরসা। সব দিক থেকেই সে ব্যতিক্রম। পুলিশে কাজ করলেও সে একজন সহানুভূতিপ্রবণ, সহৃদয় যুবক। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এমনই এক নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন এবং কঠোর মেশিনারি যা মানুষের ভেতরকার যাবতীয় নরম অনুভূতি যাঁতাকলে ফেলে পিষে চুরমার করে তাকে একটি নির্মম রোবটে পরিণত করে। সুনির্মলের মধ্যে মমতা, দায়িত্ববোধ এত বিপুল পরিমাণে রয়েছে যে এই মেশিনারির পক্ষেও তাকে পুরোপুরি করায়ত্ত করা সম্ভব হয় নি। তা ছাড়া প্রথম দিন থেকেই সে মালতীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।

ইন্দ্রনাথ ঠিক করলেন, সুনির্মলকে বাড়িতে ডাকিয়ে এনে আলোচনা করবেন। সেই অনুযায়ী একদিন তাকে ফোন করলেন।

সুনির্মল এল সন্ধের কিছু পরে। ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'একটা কথা তোমার কাছে পরিষ্কার জানতে চাই।'

সুনির্মল উৎসুক চোখে তাঁর দিকে তাকায়। বলে, 'কী?'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'মালতী যেখানে থাকে সেখানে তো তুমি গিয়েছিলে—'

সুনির্মলকে বিব্রত দেখায়। চোখ নামিয়েসে বলে, 'ওই কেসটার ব্যাপারে আমি খোঁজখবর করতে গিয়েছিলাম। নর্থ ক্যালকাটার একটা জঘন্য এলাকায় সরু গলির ভেতর মালতী থাকে, সে তো আপনাকে আগেই বলেছি। জায়গাটা স্যার ভীষণ খারাপ।' একজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাব্রতীর সামনাসামনি বসে সোজাসুজি বলতে পারছিল না যে ওটা অত্যন্ত কুৎসিত এক বেশ্যালয় অর্থাৎ কয়েক শ ওঁচা মেয়েমানুষের একটা কালোনি। তবে আকারে ইঙ্গিতে তা বুঝিয়ে দিল।

মালতী যে সোসাইটির সবচেয়ে অন্ধকারের স্তরের বাসিন্দা তা আগেই জেনেছিলেন ইন্দ্রনাথ কিন্তু রেখে ঢেকে সুনির্মল সে জায়গার যে বর্ণনা দিল তাতে ভেতরে ভেতরে সিঁটিয়ে ওঠেন।

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'ওর যা শরীরের অবস্থা তাতে ওখানে গিয়ে থাকা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে হলে প্রচুর যত্নের দরকার।'

'হ্যাঁ স্যার। ওখানে কে তাকে যত্ন করবে?'

'তা হলে?'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার। কিন্তু মালতী জেদ ধরে বসে আছে ওখানেই ফিরে যাবে।'

'আমাকেও তাই বলেছে।'

একটু চপুচাপ।

খানিক চিন্তা করে ইন্দ্রনাথ এবার জিজ্ঞেস করেন, 'ধর যদি শেষ পর্যন্ত মালতী ওখানে যায়ই আর আমি চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে একটা নার্স ঠিক করে দিই?'

সুনির্মল বলে, 'সেটা সম্ভব নয় স্যার।'

'কেন?'

'ও যা জায়গা, কোনো নার্স গিয়ে থাকবে বলে মনে হয় না।'

'বেশি টাকা দিলেও থাকবে না?'

একটু চিন্তা করে সুনির্মল বলে, 'ঠিক বলতে পারছি না।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'নার্সদের একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে। আমার বন্ধু রাজশেখরের অসুখের সময় ওখান থেকে একজন নার্সকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছিল। রাজশেখরের কাছ থেকে ফোন নাম্বার নিয়ে যোগাযোগ করব?'

'করুন না।'

আরো তিন দিন কেটে যায়।

এর মধ্যে নার্সদের অ্যাসোসিয়েশনে ফোন করেছিলেন ইন্দ্রনাথ। কিন্তু নর্থ ক্যালকাটার ওই কুখ্যাত এলাকায় গিয়ে কেউ মালতীর শুশ্রূষা করতে রাজি নয়।

কথা হয়েছিল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি অনামিকা মজুমদারের সঙ্গে। সুনির্মলকে যা বলেছিলেন, অনামিকাকেও তাই বলেছেন ইন্দ্রনাথ, 'আপনাদের যা পারিশ্রমিক তার চেয়ে অনেক বেশি দেব মিসেস মজুমদার।'

অনামিকা বলেছেন, 'পাঁচ দশ গুণ বেশি দিলেও আমাদের কেউ রাজি হবে না।'

একটু বিরক্তই হয়েছেন ইন্দ্রনাথ। বলেছেন, 'কিন্তু সেবা করাই তো আপনাদের কাজ।'

'নিশ্চয়ই। তাই বলে যেখানে সেখানে মেয়েদের পাঠাতে পারি না। সবাই ভদ্র ফ্যামিলি থেকে এসেছে। ওখানে গেলে তাদের বদনাম রটে যাবে, পারিবারিক জীবন

বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।'

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়েও কাজ হয় নি।

পনেরো

নার্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলার পরদিন একরকম জোর করেই নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে এল মালতী।

ইন্দ্রনাথ ভিজিটিং আওয়ার্সে তাকে দেখতে গিয়েছিলেন। মেয়েটাকে নিয়ে কী করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। নিরুপায় হয়ে সুনির্মলকে ফোন করলেন। আধ ঘণ্টা বাদে সে এলে বললেন, 'মালতী ওর জায়গায় ফিরে যেতে চাইছে। চল, দু'জনে ওকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

সুনির্মল ভীষণ হকচকিয়ে যায়। বলে, 'না না স্যার, আপনাকে ওখানে যেতে হবে না। আমিই ওকে নিয়ে যাব।'

এক মুহূর্ত কী ভাবেন ইন্দ্রনাথ। তারপর বলেন, 'ঠিক আছে। আমার গাড়িতে ওকে নিয়ে যাও।'

'না, আপনি আপনার গাড়িতে করে বাড়ি চলে যান। আমি মালতীকে ট্যাক্সি করে পৌঁছে দিচ্ছি।'

''ঠিক আছে। তোমাকে আরেকটু কষ্ট দেব সুনির্মল।'

'বলুন।'

'ওকে পৌঁছে দেবার পর আমাদের বাড়ি এসে খবরটা দিয়ে যেও।'

'আচ্ছা—'

'মুখার্জি সদন'-এ ফিরে আসার পর ঘণ্টা দুই কেটে যায়। কিন্তু সুনির্মল আসে না। উত্তর কলকাতার যে অঞ্চলে মালতী থাকে সেখান থেকে 'মুখার্জি সদন' খুব বেশি দূরে নয়। ওকে পৌঁছে দিয়ে এখানে আসতে এতটা সময় লাগার কারণ নেই। কিছুক্ষণ তেতলায় তাঁর নিজস্ব হল-ঘরটিতে পায়চারি করেন ইন্দ্রনাথ। তারপর ছাদে উঠে যান।

সূর্য ততক্ষণে আকাশের ঢাল বেয়ে পশ্চিম দিকের উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর মাথায় নেমে এসে সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো স্থির হয়ে আছে। বেশ খানিকটা সময় সেভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে সেটা স্কাইলাইনের ওধারে অদৃশ্য হয়।

কলকাতা মোট্রোপলিসের ওপর নেমে আসে শীতের সন্ধে। কুয়াশায় এবং অন্ধকারে ঢেকে যায় চারদিক। কালো জামদানি শাড়ির গায়ে জরির ফুলের মতো বাড়িতে এবং রাস্তায় জ্বলে উঠতে থাকে অজস্র আলো।

কিন্তু কোনো দিকেই লক্ষ্য নেই ইন্দ্রনাথের। মালতীকে তার আস্তানায় নিয়ে যাবার পর কী ঘটতে পারে? কিছুই আন্দাজ করা যাচ্ছে না। ফলে প্রচণ্ড অস্বস্তি এবং দুর্ভাবনা তাঁর মাথায় চেপে বসে।

এদিকে সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে উত্তুরে হাওয়া ছাড়ল। পরনে গরম জামা বা পুলওভার টোভার কিছু ছিল না ইন্দ্রনাথের। হিমে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল তাঁর। দ্রুত ছাদ থেকে নিচে নেমে আসেন তিনি আর তখনই ফোন বেজে ওঠে। সেটা তুলতেই ওধার থেকে সুনির্মলের গলা ভেসে আসে। ইন্দ্রনাথ চকিত হয়ে ওঠেন। বলেন, 'কী ব্যাপার, বলেছিলে মালতীকে পৌঁছে দিয়ে আমাকে খবর দিয়ে যাবে। তোমার জন্যে তখন থেকে অপেক্ষা করছি।'

সুনির্মল বলে, 'স্যার, একটা প্রবলেম হয়ে গেছে।'

'কিসের প্রবলেম?'

'মালতীকে ওর ঠিকানায় নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওখানে ওকে রাখা যাবে না।'

'কেন?'

সুনির্মল বলে, 'মালতী যেভাবে উন্ডেড হয়েছে তাতে ওর পক্ষে আর নিজের প্রফেসান চালানো সম্ভব হবে না, সে তো আপনি জানেন।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'জানি। তাতে সমস্যাটা কোথায়? মানুষের অ্যাকসিডেন্ট হয় না? অনেকে পঙ্গু হয়েও তো পড়ে! এ ধরনের অসহায় মানুষের জন্যে লোকের সহানুভূতি থাকবে না?'

'থাকা উচিত স্যার। কিন্তু ওদের ওয়ার্ল্ডটা অন্যরকম। যে পয়সা রোজগার করতে পারবে না তার দাম কানাকড়িও নয়। তাই বাড়িউলি মালতীর জিনিসপত্র বার করে দিয়ে ঘরটা অন্য মেয়েকে দিয়েছে।'

'সে কী!'

'হ্যাঁ স্যার।'

'হিউম্যান কনসিডারেশান বলতে কি কিছু নেই?'

সুনির্মল চুপ করে থাকে।

ইন্দ্রনাথ এবার বলেন, 'ওর বাড়িউলি না কী, তাকে ভাল করে বোঝালে না কেন?'

সুনির্মল বলে, 'দু ঘণ্টা ধরে বুঝিয়েছি। এমন কি ভয়ও দেখিয়েছি কিন্তু কাজ

কিছুই হল না। মালতীকে নিয়ে এখন কী করব বুঝতে পারছি না।'

ইন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ কী ভাবেন, তারপর মনস্থির করে বলেন, 'এক কাজ কর, ওকে নিয়ে আপাতত আমার এখানে চলে এস।'

কথাগুলো শোনার পরও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না সুনির্মল। সে বলে, 'আপনার বাড়িতে! মালতীকে!' টেলিফোনে ওধার থেকে আর্তনাদের মতো তার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

'হ্যাঁ। তাই তো বললাম।'

'অপরাধ যদি না নেন একটা কথা বলব?'

'বল।'

'আপনাদের ওই বাড়িতে দেশের সেরা মানুষেরা এসেছেন। 'মুখার্জি সদন' আমাদের গ্লোরিয়াস পাস্টের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাছাড়া সারা দেশ আপনাকে সম্মান করে। সেখানে মালতীর মতো একটা মেয়ে—' বলতে বলতে থেমে যায় সুনির্মল। অনকক্ষণ পর আবার বলে, 'আপনার কাছে বিশেষ আর্জি, ঝোঁকের মাথায় কিছু করবেন না।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'ঝোঁকের মাথায় বা ইমোশনালি কিছু করার বয়েস আমার নয়। অনেক ভেবেচিন্তেই ওকে আনতে বলছি। প্রবলেম কিছু হলে তখন দেখা যাবে।'

সুনির্মল আর আপত্তি করতে সাহস পায় না। শুধু বলে, 'ঠিক আছে স্যার, পনেরো কুড়ি মিনিটের ভেতর চলে আসছি।'

ফোন নামিয়ে রেখে ইন্দ্রনাথ একতলায় নেমে এসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না, সুনির্মলরা একটা ট্যাক্সিতে করে এসে গেল। ড্রাইভার দরজা খুলে দিতে আস্তে আস্তে নিচে নামল মালতী। শাড়িব ওপর যদিও গরম চাদর রয়েছে তবু বোঝা যায় ভেতরে প্রায় সারা শরীর জুড়ে ব্যান্ডেজ।

ট্যাক্সিটা যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে আঠারোটা সিঁড়ি ভেঙে গ্রাউন্ড ফ্লোরে উঠতে হয়। ওপর থেকে ইন্দ্রনাথ লক্ষ করলেন, সিঁড়ি বাওয়া মালতীর পক্ষে সম্ভব নয়। অ্যাম্বুলেন্সের কথা আগে ভাবেব নি। তার ব্যবস্থা করলে মেয়েটাকে স্ট্রেচারে করে ওপরে নিয়ে যাওয়া যেত। ইন্দ্রনাথ বংশী আর অন্য কাজের লোকদের ডেকে তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার আনতে বললেন। এদিকে সুনির্মলও ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়েছিল।

চেয়ার আনা হলে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'ওকে চেয়ারে বসিয়ে সাবধানে তেতলায় নিয়ে চল।' বংশীকে বললেন, 'তেতলায় ডান দিকের কোণের ঘরে মালতী থাকবে। বিছানার চাদর টাদর পাল্টে ঘরটা এক্ষুনি পরিষ্কার করে দিবি।'

'আচ্ছা—' বলেই বংশী একসঙ্গে দু-তিনটে করে সিঁড়ি টপকে তেতলার দিকে চলে যায়।

ইন্দ্রনাথের নিজস্ব ড্রাইভার ভোলা, দারোয়ান ধানোয়ার সিং এবং নরহরি মালতীকে চেয়ারে বসায়, তারপর ধরাধরি করে ওপরে তুলতে থাকে। তাদের পেছন পেছন ইন্দ্রনাথ আর সুনির্মলও সিঁড়ি ভাঙতে থাকেন।

এ বাড়ির সিঁড়িগুলো খুবই চওড়া, পাশাপাশি ওপরে উঠতে ইন্দ্রনাথদের অসুবিধা হচ্ছিল না।

'মুখার্জি সদন'-এ আগে বার তিনেক এসেছে সুনির্মল কিন্তু কখনও আজকের মতো এমন অস্বস্তি বোধ করে নি। তার মনে হচ্ছিল মালতীকে এখানে নিয়ে আসা তার ঠিক হয় নি। এ বাড়ির দেড় শ বছরের পবিত্রতা এবং গৌরব তার জন্য নষ্ট হয়ে গেছে। ইন্দ্রনাথ যখন মালতীকে আনার কথা বলেছিলেন তখন আরো জোর করে তাঁকে বাধা দেওয়া উচিত ছিল। একসময় চাপা গলায় সে ডাকে, 'স্যার—'

দূরমনস্কর মতো কিছু ভাবছিলেন ইন্দ্রনাথ। একটু চমকে উঠে মাথাটা সামান্য হেলিয়ে সুনির্মলের দিকে তাকান। জিজ্ঞেস করেন, 'কিছু বলবে?'

সুনির্মল বলে, 'হ্যাঁ স্যার। আমি কি মেয়েদের কোনো লজ টজে খোঁজ করব?'

বুঝতে না পেরে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'মেয়েদের লজ?'

সুনির্মল বলে, 'আজকাল যে সব মেয়ের কলকাতায় থাকার জায়গা নেই তাদের অনেকেই বাড়ি ভাড়া করে একসঙ্গে থাকে। অনেকটা মেসের মতো ব্যবস্থা।'

'তা দিয়ে কী হবে?'

'ওই মালতীর জন্যে। ওকে চিরকাল তো এ বাড়িতে রাখতে পারবেন না। আপনার ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজনরা জানতে পারলে—'

এসব যে ইন্দ্রনাথ আগে ভাবেন নি তা নয়। সুনির্মলকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'জানতে পারলে জানবে। অন্যায় তো কিছু করছি না।' একটু থেমে কী ভেবে বলেন, 'মালতীকে যদি অন্য কোথাও পাঠাতে হয় তোমাকে জানাব।'

আস্তে মাথা নাড়ে সুনির্মল।

তেতলায় এসে দেখা গেল বংশী কোণের ঘরের বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় পালটে, ধুলো সাফ করছে। দু-চার মিনিটের মধ্যে ঘরটা ফিটফাট হয়ে যাবে।

মালতীকে এনে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো। কেননা সে আর বসে থাকতে পারছিল না। নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে নর্থ ক্যালকাটার কুখ্যাত গলি হয়ে 'মুখার্জি সদন'-এ আসতে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে। যদিও গাড়িতেই এসেছে, দুর্বল শরীর এতটা ধকল নিতে পারে নি।

নার্সিং হোম থেকে মালতীর জন্য লম্বা একখানা প্রেসক্রিপশান করে দিয়েছিল। কী কী ওষুধ কত ঘণ্টা পর পর খেতে হবে, ডায়েটের ব্যবস্থা কী হবে, সব বিশদভাবে তাতে লেখা আছে। ডাক্তার আরো পরামর্শ দিয়েছেন, মালতী যেন একা একা হাঁটাহাঁটি না করে, সিঁড়ি ভাঙা তার বারণ। অন্তত পুরো একটি মাস তাকে প্রায় সর্বক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। শরীর সচল রাখার জন্য হুইল চেয়ার ব্যবহার করা খুব জরুরি। সপ্তাহখানেক পর দিনে পনেরো কুড়ি মিনিট ওকে ধরে ধরে হাঁটানো দরকার। এভাবে মালতী ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনযাপনের মধ্যে ফিরে আসবে। ওর পরিচর্যার জন্য একজন অভিজ্ঞ নার্সের প্রয়োজন যে চব্বিশ ঘণ্টা ওর কাছে থাকবে।

প্রেসক্রিপশানটা ইন্দ্রনাথকে দিতে তিনি সুনির্মলকে নিয়ে পড়ার টেবিলে এসে বসেন। বলেন, 'ডাক্তার যা যা লিখে দিয়েছেন আজই তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তুমি আমাকে একটু হেল্প কর।'

সুনির্মল জিজ্ঞেস করে, 'কী করতে হবে বলুন।'

ইন্দ্রনাথ একটা মোটা ডায়েরির পাতা উলটে উলটে কয়েকটা ফোন নাম্বার বার করে এক টুকরো কাগজে লিখে সুনির্মলকে দিতে দিতে বলেন, 'এই নাম্বারগুলোতে পর পর ডায়াল করে আমাকে দাও।'

নাম্বারগুলোর কোনোটা নার্স অ্যাসোসিয়েশনের, কোনোটা মেডিকেল অ্যাপ্লায়েন্স সাপ্লায়ারদের। ফোন করে প্রথমে হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করে ফেললেন ইন্দ্রনাথ। কাল বিকেলের মধ্যেই ওটা পাওয়া যাবে। কিন্তু নার্সদের অ্যাসোসিয়েশন জানালো, তাদের সব নার্সই এনগেজড। একজন ট্রেন্‌ড নার্স অবশ্য পাওয়া যেতে পারে কিন্তু আপাতত কয়েক দিন রাতে সে থাকতে পারবে না। সকাল আটটায় গিয়ে সারা দিন থেকে রাত আটটায় বাড়ি ফিরে যাবে। অবশ্য সে চলে আসার পর রাতে মালতীর যাতে অসুবিধা না হয় তার সব ব্যবস্থা করে আসবে। অগত্যা তাতেই রাজি হতে হয়েছে ইন্দ্রনাথকে।

হুইল চেয়ার এবং নার্সের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হবার পর প্রেসক্রিপশান ভোলাকে দিয়ে ওষুধ আনতে পাঠালেন ইন্দ্রনাথ। মালতী রাতে মাংসের স্টু, নরম টোস্ট আর দুধ খাবে। বংশীকে তার ব্যবস্থা করতে বললেন।

একসময় সুনির্মল বলে, 'এবার তা হলে আমি যাই।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'আচ্ছা এস। মাঝে মাঝে খবর নিও।'

'নিশ্চয়ই। মাঝে মাঝে কেন, রোজ একবার আপনাকে ফোন করব। দরকার হলে আপনিও করবেন।'

'অবশ্যই।'

সবাই চলে যাবার পর বিশাল হল-ঘরটা একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়। ইন্দ্রনাথ যেখানে বসে আছেন সেখান থেকে দক্ষিণ দিকের কোণের ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরের খানিকটা অংশ চোখে পড়ে। মালতী উলটো দিকের দেওয়ালের দিকে ফিরে কাত হয়ে শুয়ে আছে। তার খোলা চুল, বাঁ গালের একাংশ আর কাঁধ ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

মালতীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুনির্মলের সেই কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল। তিনি কি আবেগ বা ঝোঁকের বশে এই মেয়েটাকে বাড়িতে এনে তুললেন? পরে কি এর জন্য তাঁকে অনুশোচনা করতে হবে? মনের গভীর তলদেশ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করেন ইন্দ্রনাথ কিন্তু পরে আক্ষেপ হতে পারে এমন কোনো কারণই সেখানে খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনি জানেন স্ত্রী ছেলেমেয়ে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনরা খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেবে। তবু ঘুণাক্ষরেও মনে হল না তিনি কোনো অন্যায় করেছেন। অবশ্য এই কঠোর দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে অদূর ভবিষ্যতে যে প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে হবে, সে সম্পর্কে কোনো সংশয় নেই।

বংশী কাচের জগে খাবার জল এনে রেখেছিল। ইন্দ্রনাথ নিজেই একটা গেলাসে জল ভরে দুটো ট্যাবলেট বেছে নিয়ে মালতীর কাছে চলে এলেন। ফোনে যা কথা হয়েছে তাতে নার্স এখনই চলে আসবে। আজ ঘণ্টাখানেকের বেশি থাকতে পারবে না। সে চলে যাবার পর বাকি রাতটুকুর দায়িত্ব নিতে হবে ইন্দ্রনাথকেই।

পায়ের শব্দে মুখ ফেরায় মালতী। ইন্দ্রনাথকে জল আর ওষুধ আনতে দেখে প্রথমটা সে হতচকিত। তারপর ধড়মড় করে উঠে বসার চেষ্টা করে।

ইন্দ্রনাথ প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'উঠো না, উঠো না।'

মালতী কুঁকড়ে একেবারে এতটুকু হয়ে যায়। ধীরে ধীরে ফের শুয়ে পড়তে পড়তে নির্জীব স্বরে বলে, 'এ আপনি কী করছেন?'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'সামান্য কর্তব্য করছি।'

মালতী ম্রিয়মাণ স্বরে বলে, 'এমনিতেই আমি মহাপাপী। কেন আর নতুন করে পাপ বাড়াচ্ছেন?'

ইন্দ্রনাথ সস্নেহে হাসেন। বলেন, 'অসুস্থ শরীরে এত কথা বলে না। এই ওষুধটা খেয়ে নাও।'

একরকম নিরুপায় হয়েই যেন বালিশ থেকে মাথাটা অল্প একটু তুলে এক ঢোক জল মুখে নিয়ে ট্যাবলেট দুটো খেয়ে ফেলে মালতী। তারপর বলে, 'এটা আপনি ঠিক করলেন না।'

ইন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, মালতী ট্যাবলেট খাওয়ানোর কথা বলছে। তিনি কী উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মালতী আবার বলে, 'পুলিশ সাহেব আপনাদের এই বাড়ি সম্বন্ধে আমাকে সব বলেছেন। আমাকে এখানে আনা আপনার ঠিক হয় নি। আপনাদের বাড়ি আমার ছোঁয়ায় নোংরা হয়ে গেল।'

কোন স্তর থেকে সে উঠে এসেছে, সমাজে তার কী পরিচয়, এক মুহূর্তের জন্য মালতী তা ভুলতে পারছে না। তার ধারণা সে আসায় বিখ্যাত 'মুখার্জি সদন'-এ পাপের বীজাণু ঢুকে এখানকার শুদ্ধতা নষ্ট হয়ে গেছে। হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিতে দিতে ইন্দ্রনাথ খানিক আগে সুনির্মলকে যা বলেছিলেন, মালতীকেও সেই কথাগুলিই আরেক বার বলেন, 'যা আমি ভাল বুঝেছি তাই করেছি। এখন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠ।'

'কিন্তু—'

'আবার কী?'

'আপনার ছেলেমেয়েরা, আপনার—'

মালতীকে থামিয়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'সে সব আমি বুঝব। আর কথা বলো না, চুপচাপ শুয়ে থাকো।' বলে আর দাঁড়ান না, সোজা নিজের টেবলে ফিরে আসেন।

সোয়া সাতটা নাগাদ মালতীর নার্স এল। বংশীই তাকে তেতলায় ইন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল। গোলগাল চেহারা, বেশ হাসিখুশি। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মুখে স্নিগ্ধ একটি হাসি লেগেই আছে। দেখামাত্র মনে হয় সেবিকা ছাড়া আর কোনো ভূমিকায় তাকে মানাত না। এর ওপর অসুস্থ মুমূর্ষু মানুষের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

নিজের পরিচয় দিয়ে সে বলল, 'আমরা নাম চারুলতা মজুমদার। পেশেন্ট কোথায়?'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'এই যে এখানে। এস—' বলেই হঠাৎ কী খেয়াল হতে সামান্য বিব্রতভাবে বললেন, 'তুমি করে বললাম কিন্তু। কিছু মনে করলে না তো?'

একটু হেসে চারুলতা বলে, 'আপনি করে বললেই মনে করতাম।'

ইন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন না, ভারি ভাল লাগল তাঁর মেয়েটিকে। চল্লিশ বছরের এক মধ্যবয়সিনীকে ঠিক মেয়ে বলা যায় না। কিন্তু ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তার বয়সের এতই তফাত যে মেয়ে বললে বা ভাবলে বেমানান হয় না।

চারুলতাকে নিয়ে কোণের দিকে মালতীর ঘরে চলে এলেন ইন্দ্রনাথ। মালতী

ওঁদের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে ছিল। দুর্বল জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না।

ইন্দ্রনাথ দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর মালতীকে বলেন, 'এ তোমার নার্স। এখন থেকে তোমার সব দায়িত্ব এর।'

মালতী এবারও কিছু বলে না।

চারুলতা একটা মোটা কাপড়ের ব্যাগ সঙ্গে করে এনেছিল। সেটার ভেতর নার্সের পোশাক, থার্মোমিটার, রক্তচাপ মাপার মেশিন, এমনি টুকিটাকি দরকারি জিনিস রয়েছে।

ব্যাগটা একধারে নামিয়ে রেখে চারুলতা ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করে, 'পেশেন্টের রোগটা কী ধরনের?'

ইন্দ্রনাথ সংক্ষেপে জানিয়ে দেন।

সব শোনার পর চারুলতা বলে, 'নার্সিং হোমের শেষ প্রেসক্রিপশানটা কোথায়?'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'এই যে—' মালতীর মাথার কাছে একটা নিচু টেবলে প্রেসক্রিপশান এবং ওষুধ সাজানো রয়েছে। সেগুলো দেখিয়ে দেন তিনি।

চারুলতা নানা ধরনের ট্যাবলেট, ক্যাপসুল আর টনিকের শিশি, ইঞ্জেকশানের ফায়েল দেখতে থাকে।

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'হুইল চেয়ারের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। আশা করি কাল বিকেলে এসে যাবে।'

'হ্যাঁ, ওটা খুব দরকার।'

'তোমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জানিয়েছেন তুমি এখন কিছুদিন রাতের দিকে থাকতে পারবে না। এতে পেশেন্টের ক্ষতি হবে না তো?'

চারুশীলা বলে, 'রাত ন'টা থেকে অন্য এক পেশেন্টকে অ্যাটেন্ড করতে হচ্ছে। আর দিন সাত আট, তারপর থেকে দিনরাত থাকতে পারব।'

'ঠিক আছে।'

চারুশীলা বলে, 'আপনার আর কষ্ট করে এখানে থাকার দরকার নেই। আমি পেশেন্টকে দেখছি।'

ইন্দ্রনাথ আর দাঁড়ান না, সোজা নিজের পড়ার টেবলে ফিরে যান। রাতের দিকে তিনি কখনও লেখেন না। শুধু পড়েন। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন কোন পর্যায়ে রয়েছে সে সম্পর্কে আমেরিকার একটা কাগজে একজন অর্থনীতিবিদ ভাল একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। কাল তার একটা অংশ পড়েছিলেন। আজ স্থির করেছেন বাকিটা শেষ করবেন। এই প্রবন্ধটায় কয়েকটি বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত

করা হয়েছে যা তাঁর নিজের লেখার কাজে প্রচুর সাহায্য করবে।

এমন একটা জরুরি লেখাও ইন্দ্রনাথকে মগ্ন রাখতে পারছিল না, বার বার তাঁর মনোযোগ ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর পরই তাঁর চোখ চলে যাচ্ছিল মালতীর ঘরের দিকে।

এর মধ্যে চারুশীলা শাড়িটাড়ি পালটে নার্সের ধবধবে পোশাক পরে ক্ষিপ্র হাতে মালতীর পরিচর্যা শুরু করে দিয়েছে।

একসময় বংশী চিকেন সুপ, টোস্ট আর দুধ নিয়ে মালতীর ঘরে যায়। পথ্য এবং ওষুধ খাওয়াতে খাওয়াতে আটটা বেজে গেল। তারপর চারুশীলা ফের পোশাক বদলে মালতীকে কী বলে তার ব্যাগ নিয়ে সোজা চলে আসে ইন্দ্রনাথের কাছে। টেবলের ওধার থেকে বলে, 'এবার আমি যাব।'

'আচ্ছা—' আস্তে মাথা নাড়েন ইন্দ্রনাথ।

'যে ওষুধ পেশেন্টকে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সিডেটিভ আছে। সকালের আগে ঘুম ভাঙার সম্ভাবনা নেই। রাতে কোনো সমস্যা হবে না। তবু কাউকে বলে দেবেন, মাঝ রাত্তিরের দিকে যেন একবার গিয়ে ওকে দ্যাখে। যদি পেইন টেইন কিছু হয় সাদা রঙের যে ট্যাবলেট রয়েছে তার একটা খাইয়ে দিলেই হবে।'

ইন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবেন, কাকে আর বলবেন, মাঝরাতে উঠে নিজেই গিয়ে মালতীকে দেখবেন। বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি কাল সকালে কখন আসছ?'

'আটটার ভেতর চলে আসব। তার আগে ঠিক সাতটায় পেশেন্টকে মুখ টুখ ধুইয়ে কিছু খাইয়ে লাল রঙের ক্যাপসুলটা দিতে হবে।'

'আচ্ছা—'

যা বলার বলা হয়ে গেছে। তারপরও কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে চারুশীলা। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি আর কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ।' চারুশীলা আস্তে মাথা নাড়ে।

'বল না—'

'আপনি কিছু মনে করবেন না তো?'

ভেতরে ভেতরে সামান্য থতিয়ে যান ইন্দ্রনাথ। মুখে বলেন, 'না না, মনে করব কেন? তুমি বল—'

চারুশীলা একটু দ্বিধান্বিতভাবে জিজ্ঞেস করে, 'পেশেন্ট, মানে মালতী কি আপনাদের কেউ হয়?'

'হঠাৎ এই প্রশ্ন?'

'না, মানে এ বাড়ির সঙ্গে ওকে ঠিক মানায় না।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন ইন্দ্রনাথ। তারপর বলেন, 'ওর সঙ্গে আমাদের এমনিতে কোনোরকম সম্পর্ক নেই। তবে মেয়েটা আমাদের এমন উপকার করেছে যে আমরা সবাই খুব কৃতজ্ঞ। ওর আজ যে অবস্থা দেখছ, সেটা আমাদের বাঁচাতে গিয়েই হয়েছে। আমাদের মানসম্মান আর প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে মালতী মরতে বসেছিল। তাই—'

চারুশীলা বলে, 'তাই সব জেনেশুনেও একটা পতিতাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছেন।'

খুব সহজভাবেই কথাগুলো বলেছে চারুশীলা। বোঝা যাচ্ছে অভিজ্ঞ নার্সের চোখ মালতীর সঠিক পরিচয়টা ধরে ফেলেছে। ইন্দ্রনাথ চমকে ওঠেন। বলেন, 'তুমি কি তা হলে নার্সিং করবে না?'

চারুশীলা হেসে ফেলে। বলে, 'তা কি আমি বলেছি? যদি আমার আপত্তি বা ঘেন্নাই হতো, কাল সকালে আসার কথা কি বলতাম?' এরপর সে যা বলে তা এইরকম। কাজের ব্যাপারে সে আগাগোড়া প্রফেশনাল। সেবাযত্ন করেই যখন তার রুজিরোজগার তখন পেশেন্ট নিয়ে কোনোরকম বাছবিচার নেই। মঠের পবিত্র সন্ন্যাসিনী থেকে ওঁচা মেয়েমানুষ পর্যন্ত সবাই তার কাছে সমান।

চারুশীলা আরো বলে, 'এমন একটা মেয়েকে বাড়িতে জায়গা দিয়েছেন, সে জন্যে আপনার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। আচ্ছা চলি।'

এ জাতীয় কথা সুনির্মল ছাড়া আর কেউ তাঁকে বলে নি। তাঁর বিবেক, তাঁর কৃতজ্ঞতা বোধ, তাঁর বিচারবুদ্ধি — সব মিলিয়ে মনে হয়েছে মালতীকে আশ্রয় দেওয়াটা জীবনের সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য। স্ত্রী ছেলেমেয়ে কেউ এতে সায় দেবে না। কিন্তু পৃথিবী শুধু তাঁদের মুখার্জি বংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার বাইরেও কেউ কেউ আছে যারা নৈতিক সমর্থনই শুধু জানায় নি, শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে পাশে এসেও দাঁড়িয়েছে।

ষোল

মালতী এ বাড়িতে আসার পরও ইন্দ্রনাথের দৈনন্দিন রুটিনে কোনোরকম হেরফের হল না। চারুশীলা যদিও সকালে আটটার আগে আসে না, তাতে অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই। কেননা আগের দিন রাতে মালতীকে যে ওষুধটা খাওয়ানো হয় তাকে খানিকটা সিডেটিভ থাকে। ফলে তার ঘুম ভাঙতে ভাঙতে আটটা সাড়ে

আটটা হয়ে যায়। তার অনেক আগেই ময়দানে প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফিরে আসেন ইন্দ্রনাথ। যতক্ষণ না ফেরেন, বংশী তেতলার হল-ঘরে বসে থাকে। হঠাৎ মালতীর ঘুম ভেঙে গেলে সে তার দেখাশোনা করতে পারবে।

দিন সাতেক হল 'মুখার্জি সদন'-এ এসেছে মালতী। এর মধ্যে রোজই সে জেগে ওঠার আগে ইন্দ্রনাথ তো ফিরছেনই, চারুশীলাও চলে আসছে। কাজেই এখন পর্যন্ত কোনোরকম সমস্যা হয় নি।

চারুশীলা এসেই নার্সের পোশাক পরে একেবারে কম্পিউটারের দক্ষতায় মালতীর পরিচর্যা শুরু করে দেয়। ওষুধ খাওয়ানো, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ বা ক্ষতের জায়গাগুলোতে ড্রেসিং করা, সব চলছে ঘড়ির কাঁটা ধরে। তেতলার গা ঘেঁষে রয়েছে পাঁচিল-দেওয়া অনেকটা খোলা ছাদ। হল-এর পশ্চিম দিকের দরজা খুলে সেখানে যাওয়া যায়। রোজ সকালে আর বিকেলে দু বেলা চারুশীলা মালতীকে ধরে ধরে সেখানে হাঁটিয়ে আনে। হুইল চেয়ারে বসে কিভাবে সেটা চালাতে হবে তার প্রক্রিয়া তাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ চারুশীলার সাহায্য ছাড়াই ঘুরে বেড়ায় মালতী। স্বাভাবিক জীবন যাপনের দিকে সে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে।

এদিকে সারাদিনের বেশির ভাগ সময়টাই ইন্দ্রনাথের কাটে তেতলায়। সাত-আট ঘণ্টা হলঘরে লেখাপাড়ার কাজ করেন। ভোরে ভ্রমণের জন্য একবারই বাইরে বেরোন। বাকি দিনটা বাড়িতেই কেটে যায়। তেতলার পুব দিকের কোণের ঘরটা তাঁর বেডরুম। সেখানেই তাঁর ঘুম এবং বিশ্রাম। আগে মাঝেমধ্যে বিকেলের দিকে বাইরে বেরুতেন। মালতী আসার পর সেটা বন্ধ হয়ে গেছে।

আরো একটা পরিবর্তন হয়েছে ইন্দ্রনাথের দৈনন্দিন রুটিনে। বিকেলে তিনি কদাচিৎ বেরুলেও তাঁর পুরনো ছাত্রছাত্রীরা, বন্ধুরা, দু-একজন আত্মীয়স্বজন বা প্রকাশকরা মধ্যে মধ্যে আসতেন। অবশ্য আসার আগে সবাই ফোন করে জেনে নিতেন, তাঁকে বাড়িতে পাওয়া যাবে কিনা। মালতী আসার পর ইদানীং ইন্দ্রনাথ কিছুটা মিথ্যাচারই করছেন। কেউ ফোন করলেই জানিয়ে দিচ্ছেন, বিকেলে বাড়ি থাকবেন না। আসলে কারণটা ভয় নয়। দর্শনার্থীরা মালতীকে দেখলে হাজারটা কৈফিয়ৎ দিতে হবে। অকারণে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াবার জন্য এটা তাঁর কৌশলমাত্র। অবশ্য ইন্দ্রনাথ জানেন, মালতীর ব্যাপারটা একদিন না একদিন জানাজানি হবেই। তাঁর মনোভাব—যখন হবে তখন দেখা যাবে।

ছেলেমেয়েরা এবং স্ত্রী আগেকার কর্মসূচি অনুযায়ী সোম থেকে শুক্র এবং রবি, রোজ আড়াই মিনিটের লং ডিসটান্স ফোন করে যাচ্ছে। বিষয়বস্তু সেই পুরনো,

গতানুগতিক। সাত আট বছর ধরে যা শুনে আসছেন তাতে এতটুকু হেরফের নেই। আমরা ভাল আছি, তুমি কেমন আছ, ইত্যাদি। অবশ্য নতুনত্বের মধ্যে ইদানীং একটা মাত্রা যোগ হয়েছে। এই বাড়িটা অর্থাৎ 'মুখার্জি সদন'-এর ভবিষ্যৎ কী, কিভাবে তার বিলিব্যবস্থা করতে চলেছেন ইন্দ্রনাথ তা সাগ্রহে জানতে চায় সবাই। কলকাতায় তারা যা বলে গিয়েছিল অর্থাৎ 'মুখার্জি সদন' বেচে ইন্দ্রনাথ যাতে আমেরিকায় চলে যান সে জন্য নিয়মিত চাপ দিচ্ছে।

এর মধ্যে একদিন আলিপুর থেকে ফোন করেছিলেন দেবকুমার। বললেন, 'কী ঠিক করলেন বেয়াই মশাই?'

দেবকুমার কী জানতে চান, বুঝতে না পারার কারণ নেই। তবু ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কোন ব্যাপারে?'

'ওই যে আমেরিকায় চলে যাবার কথা হয়েছিল—' বলতে বলতে থেমে যান দেবকুমার।

ইন্দ্রনাথ সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলেন, 'আপনি কিছু স্থির করেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। এক বড় প্রোমোটারের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। ডীডস অবশ্য করি নি। তবে আমাদের বাড়িটা বিক্রি করে দিচ্ছি। আপনাকে আগেই বলেছিলাম, রোহিত আমার একমাত্র সন্তান, ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই। শেষ জীবনটা ছেলে আর বউমার সঙ্গে কাটাতে চাই।'

'তা বলেছেন। কিন্তু বাড়িটা ডিসপোজ করে দিলে দেশের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই তো আর থাকবে না। এতকালের রুটটা তুলে নিয়ে সত্যিই চলে যাবেন?'

দেবকুমার বলেন, 'একেবারে তুলে নিয়ে যাচ্ছি না। কখনও যদি রোহিত বা আমার দেশে ফেরার ইচ্ছা হয়, তার একটা ব্যবস্থা করেছি।'

ইন্দ্রনাথ উৎসুক সুরে জানতে চান, 'কিরকম?'

'প্রোমোটারদের সঙ্গে কথা হয়েছে তারা টাকা ছাড়াও একটা পুরো ফ্লোর আমাদের দেবে। ফলে দেশের সঙ্গে সম্পর্কটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল না।'

ইন্দ্রনাথ উত্তর দেন না।

দেবকুমার এবার বলেন, 'আপনি কি আপনাদের বাড়ির বিষয়ে কোনো প্রোমোটারের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'আমি তো আপনাকে আগেই জানিয়েছি বাড়ি বিক্রি করব না। দেশ ছেড়ে আমেরিকায় গিয়ে থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।'

দেবকুমার নতুন করে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, স্বজনহীন একা একা কলকাতায় পড়ে থাকার মানে হয় না। ইন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই চাইবেন জীবনের শেষ পর্বটা

ছেলেমেয়ে নাতিনাতনিদের মধ্যে আনন্দে কাটুক। দেবকুমারের মতো তিনিও বাড়ি বিক্রি করে নগদ টাকা ছাড়াও একটা কি দুটো ফ্লোর নিয়ে নিন। দেশে ফেরার ইচ্ছা হলে হোটেল বা আত্মীয়স্বজনের বাড়ি উঠতে হবে না। ইন্দ্রনাথের মাথায় বংশের রুট ফিক্সেশানের মতো আটকে আছে। রুট থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে না।

সব শোনার পর ইন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আপনার কথা আমার কথা মনে থাকবে।' বাড়ি নিয়ে যা ভাবার আগেই ভেবে রেখেছেন তিনি। নিজের সিদ্ধান্ত থেকে কেউ তাঁকে এতটুকু নড়াতে পারবে না।

মালতী আসার পর বারো দিন কেটে গেল। চারুশীলার যত্ন আর শুশ্রূষায় এখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে সে। আগের সেই দুর্বলতা ততটা নেই। এখন আর চারুলতাকে হুইল চেয়ার ঠেলে ঠেলে ছাদে নিয়ে যেতে হয় না। মালতী নিজে নিজেই চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তবে একা একা এখনও হাঁটতে পারে না। বাচ্চাদের মতো ধীরে ধীরে চারুশীলা তাকে পা ফেলতে সাহায্য করে।

ইদানীং টেবলে বসে নিজের লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে যখনই ইন্দ্রনাথ মুখ তোলেন দেখতে পান, অবাক বিস্ময়ে তাঁকে লক্ষ করছে মালতী। এমন কি হুইল চেয়ারে বসে ছাদে যখন ঘুরে বেড়ায় কিংবা চারুশীলা তার কাঁধে হাত রেখে হাঁটাতে থাকে তখনও তার চোখ ইন্দ্রনাথের মুখের ওপর আটকে থাকে। মনে হয় তাঁর সম্বন্ধে মেয়েটার অপার কৌতূহল, কিছু একটা যেন সে বলতে চায়। অবশ্য এ নিয়ে তিনি কখনও প্রশ্ন করেন নি।

একদিন টেবলের ওপর ঝুঁকে খুব মগ্ন হয়ে লিখছিলেন ইন্দ্রনাথ, হঠাৎ হুইল চেয়ারের আওয়াজে চমকে মুখ তোলেন। মালতী টেবলের ওধারে চলে এসেছে।

আগে আর কখনও এভাবে মেয়েটা তাঁর কাছে আসে নি। কোণের দিকের ঘর আর পাশের ছাদে তার গতিবিধি ছিল সীমাবদ্ধ। চারুশীলাকে আশেপাশে কোথাও দেখা গেল না। খুব সম্ভব সে বাথরুমে রয়েছে। রীতিমত অবাক হয়ে ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কিছু বলবে?'

কাঁচুমাচু মুখে মালতী বলে, 'হ্যাঁ। কিন্তু--'

'কী?'

'আমি বোধহয় আপনার কাজের ক্ষতি করলাম।'

লেখাপড়ার সময় কেউ কথা বললে খুবই বিরক্ত হন ইন্দ্রনাথ কিন্তু মালতীর ব্যাপারটা আলাদা। কলমের মাথায় ক্যাপ পরাতে পরাতে তিনি সস্নেহে হাসেন। বলেন, 'না না, দশ মিনিট পরে লিখলে কোনো ক্ষতি হবে না। কী বলবে বল—'

মালতী বলে, 'পুলিশ সাহেবের কাছে শুনেছি আপনি খুব পণ্ডিত মানুষ। সারাদিন কী অত লেখেন?'

একটু কৌতুক বোধ করেন ইন্দ্রনাথ। মজার গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'কী লিখি আন্দাজ কর তো।'

'বঙ্কিমচন্দ্র আর শরৎচন্দ্রের মতো নভেল?'

ইন্দ্রনাথ চকিত হয়ে ওঠেন। মালতীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে কখনই তাকে আকাট মূর্খ মনে হয় নি। ওঁচা বেশ্যাপাড়ার মেয়েদের সম্বন্ধে পরিষ্কার কোনো ধারণাই নেই তাঁর। তবু যেটুকু শুনেছেন তাতে মনে হয়েছে সর্বক্ষণ ওদের মুখে খিস্তি খেউড় লেগে থাকে। সেদিক থেকে মালতী অনেক ভব্য, নোংরা জীবনযাপন করলেও তার মধ্যে রয়েছে এক ধরনের শিষ্টাচার, শালীনতাবোধ। তার মুখ থেকে এখনও পর্যন্ত এমন একটি শব্দও বেরোয় নি যা 'মুখার্জি সদন'-এর পরিবেশকে দূষিত করে তোলে। তাই বলে শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের নাম তার কাছে শোনা যাবে, এতটা ভাবা যায় নি। ব্যাপারটা খুবই চমকপ্রদ।

কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে থাকার পর ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা পড়েছ?' তাঁর চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে অসীম আগ্রহ।

উদ্দীপ্ত মুখে মালতী ওই দুই বিখ্যাত সাহিত্যিকের যাবতীয় উপন্যাসের নাম বলে যায়। শুধু তাঁদেরই না, রবীন্দ্রনাথ থেকে আধুনিক কালের অনেক লেখকের বইও তার পড়া।

ইন্দ্রনাথের বিস্ময় বাড়ছিলই। তিনি বলেন, 'এ সব বই তো এমনি এমনি পড়া যায় না। তুমি নিশ্চয়ই স্কুলে পড়াশোনা করেছ, তাই না?'

মালতী বলে, 'সেভেন পর্যন্ত পড়েছি। মায়ের শখ হয়েছিল আমাকে জজ ম্যাজিস্ট্রেট বানাবে কিন্তু যে নোংরা নরককুণ্ডে আমার জন্ম, শখ থাকলেই তো হয় না। একদিন স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে—' বলতে বলতে চুপ করে যায় সে।

মালতী সবটা না বললেও যেটুকু ইঙ্গিত দিয়েছে তা বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। যা অনিবার্য, আবহমান কাল ধরে যা চলে আসছে শেষ পর্যন্ত তার জীবনেও তাই ঘটেছিল। স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে বেশ্যাপাড়ার কদর্য জীবনযাত্রার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল মালতী।

প্রসঙ্গটা ইন্দ্রনাথের কাছে ভীষণ অস্বস্তিকর। তিনি শশব্যস্তে বলে ওঠেন, 'আমি নাটক নভেল লিখতে পারি না। লিখলে তুমি নিশ্চয়ই জানতে পারতে।'

মালতী জিজ্ঞেস করে, 'তা হলে কী লেখেন?'

একটু চুপ করে থেকে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'আমাদের ইতিহাস। আমরা বাঙালিরা

কী ছিলাম আর কী হয়েছি — সেই সব কথা।'

মালতী বুঝতে পারে কিনা কে জানে, স্থির চোখে সে তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ কী মনে হওয়ায় ইন্দ্রনাথ বলেন, 'আমি যে বইগুলো লিখেছি, আর এখন যেটা লিখছি, সবই ইংরেজিতে। তুমি যদি শুনতে চাও, মুখে মুখে বলতে পারি। শুনবে?'

দু চোখে আগ্রহ ফুটে বেরোয় মালতীর। সে বলে, 'হ্যাঁ, শুনব। বলুন—'

ইন্দ্রনাথের খেয়াল হল, এই যে ক'দিন স্ত্রী ছেলেমেয়ে জামাই নাতিনাতনিরা এখানে থেকে গেল, এমন কি নতুন বেয়াই মশাই জজ দেবকুমার মজুমদার পর্যন্ত কেউ একবারও জানতে চান নি, স্বাধীনতার পরবর্তী বঙ্গজীবনের যে ইতিহাসে তিনি হাত দিয়েছেন সেটা কতদূর এগিয়েছে। তাঁর বন্ধুবান্ধব যাঁরা তাঁর প্রতিদিনের ভ্রমণসঙ্গী তাঁদেরও এই বই সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহল নেই। অথচ এঁরা সবাই উচ্চশিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত মানুষ। বাঙালি নিয়ে যে অল্প কয়েকজন ভাবনাচিন্তা করে আর কিছু রিসার্চ স্টুডেন্ট ছাড়া এ জাতীয় বই সম্পর্কে কেউ মাথা ঘামায় না। অথচ এই মালতী, একদা যে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছে, কুৎসিত পরিবেশে অতি জঘন্য যার জীবনযাপন, যাকে প্রায় অশিক্ষিতই বলা যায়, সে কিনা গভীর ঔৎসুক্যে বাঙালির ইতিহাস শুনতে চাইছে! এই মেয়েটা সম্পর্কে তাঁর ধারণা অনেক আগেই বদলে গিয়েছিল, এখন আরো পালটে যায়। এই পরিজনবিহীন বিশাল ফাঁকা বাড়িতে কাজের লোকজন ছাড়া একা একা প্রায় নিঃশব্দে দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছিল ইন্দ্রনাথের। এবার তাঁর বইটা উপলক্ষ করে খানিকটা সময় মালতীর সঙ্গে গল্প করে কাটানো যাবে।

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'ঠিক আছে, দুপুরে খাওয়ার পর খানিকক্ষণ বিশ্রাম করো। তারপর তোমাকে শোনাব।'

মালতী মাথা হেলিয়ে বলে, 'আচ্ছা।'

সেদিন বিকেল থেকেই রোজ বাঙালির ইতিহাস টুকরো টুকরো করে শোনাতে শুরু করেন ইন্দ্রনাথ। তার মধ্যে একদিন উনিশ শতকের রেনেসাঁসের কথা এসে যায়। সেই প্রসঙ্গে তাঁরা চার জেনারেশন ধরে কী কী করেছেন, এই 'মুখার্জি সদন' যে একদা জাতীয় জীবনের নানা উদ্দীপনাময় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, এখানে লোকমান্য তিলক, রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, মদনমোহন মালব্য, বিপিন পাল, শরৎচন্দ্র, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, সিস্টার নিবেদিতা থেকে কারা কারা এসেছেন, গভীর আবেগে সব বলে যান ইন্দ্রনাথ। অনেক সময় খেয়াল থাকে না তাঁর শ্রোতাটি কে, তার বিদ্যার দৌড় কতদূর। আসলে বংশের

গৌরবময় ইতিহাস বলতে বলতে তাঁর ওপর অলৌকিক কিছু যেন ভর করে। একসময় সচেতন হতেই চুপ করে যান। মালতীর দিকে তাকিয়ে অবশ্য মনে হয়, পুরোটা না হলেও তাঁর বক্তব্য খানিকটা সে বুঝতে পেরেছে।

মালতী বলে, 'কী হলো, থামলেন কেন?'

ব্যস্তভাবে ফের শুরু করেন ইন্দ্রনাথ। নিজের আমেরিকাবাসী ইংল্যান্ডবাসী অস্ট্রেলিয়াবাসী সন্তানদের খুবই দুর্বোধ্য মনে হয় তাঁর, কিন্তু এই মেয়েটিকে যেন অনেকখানিই বুঝতে পারেন। এমন একজন আগ্রহী শ্রোতাকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না।

একদিন মালতী অদ্ভুত কথা বলে, 'অনেকদিন আগে আমার স্কুলের বইতে একটা রচনা পড়েছিলাম। তাতে লেখা ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িটা নাকি তীর্থস্থান। এ ক'দিন আপনার কাছে যা শুনলাম তাতে মনে হয় আপনাদের এই বাড়িটাও তেমনি।'

এক বারবনিতার মুখে এমন বিস্ময়কর কথা শুনবেন ভাবতে পারেন নি ইন্দ্রনাথ। তাঁর সমস্ত অস্তিত্বের ভেতর দিয়ে একটা চমক খেলে যায় যেন। মালতীর মতো একটি মেয়ের কাছে 'মুখার্জি সদন' এক অত্যন্ত মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। অথচ এ বাড়ির বংশধরেরা যারা আমেরিকান, কানাডিয়ান বা ব্রিটিশ ন্যাশানালিটি নিয়েছে বা নিতে চলেছে তাদের কাছে এই বাড়ি এবং মুখার্জি বংশের ট্রাডিশানের দাম কানাকড়িও নয়।

মুগ্ধ বিস্ময়ে মালতীর দিকে তাকিয়ে থাকেন ইন্দ্রনাথ।

সতেরো

নিয়মিত 'মুখার্জি সদন'-এ আসতে আসতে হঠাৎ দু'দিনের ছুটি নিল চারুশীলা। তার ছেলের খুব জ্বর। তাকে দেখাশোনার জন্য বাড়িতে আর কেউ নেই। তার স্বামী ভিলাইতে চাকরি করে, তাই মালতীর পরিচর্যা করতে আসা সম্ভব নয়। সাময়িক ঠেকা দেবার মতো একটা ব্যবস্থা অবশ্য সে করে দিয়েছে। অন্য একটি নার্স সকালের দিকে এসে দুপুর পর্যন্ত থেকে মালতীকে ওষুধ খাইয়ে, ড্রেসিং করে, স্নান করিয়ে, লাঞ্চ খাইয়ে চলে যাবে। বিকেল আর রাতের ওষুধ খাওয়ানো, হাঁটানো এবং পথ্য খাওয়ানোর ভার নিতে হবে ইন্দ্রনাথদের। বংশীর ওপরই তিনি পুরোপুরি সেটা দিতে পারতেন কিন্তু দায়িত্বটা দু'জনে ভাগাভাগি করে নিলেন। মালতীকে ওষুধ পথ্য

খাওয়াবে বংশী আর ধরে ধরে হাঁটাবেন ইন্দ্রনাথ।

আজ বিকেলে তেতলার ছাদে মালতীর কাঁধ ধরে ধীরে ধীরে হাঁটাচ্ছিলেন ইন্দ্রনাথ। চারদিকে আলসের ধার ঘেঁষে পেতলের টবে টবে শীতের অজস্র মরসুমী ফুল আর ক্যাকটাস। অবেলার নিভু নিভু নিরুত্তাপ রোদ অবশ্য এখনও আকাশের গা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নেমে এসে আশেপাশের বাড়িঘর এবং অলিগলি বা রাস্তার ওপর ছড়িয়ে আছে কিন্তু কতক্ষণ আর, খানিক পরেই লাটাইতে সুতো গুটনোর মতো শেষ রোদটুকু কেউ অদৃশ্য হাতে টেনে নেবে। ঝপ করে নেমে আসবে সন্ধে। প্রথমে মিহি ফিনফিনে, তারপর ঘন হয়ে ঝরতে থাকবে হিম। কলকাতার স্কাইলাইন তার রহস্যময় আবরণের তলায় ডুবে যাবে।

উত্তুরে হাওয়া বইছিল এলোমেলো। গোটা আকাশ জুড়ে প্রচুর পাখি উড়ছে। সারাদিন খাদ্যের সন্ধানে ঘোরাঘুরির পর এবার তাদের ঘরে ফেরার পালা।

কাঁধের ওপর ইন্দ্রনাথের হাতটা থাকায় খুব বিব্রত বোধ করছিল মালতী। এমনিতে পুরুষের ছোঁয়ায় কোনো প্রতিক্রিয়াই হয় না তার, সমস্ত অনুভূতিই যেন অসাড় হয়ে গেছে। কিন্তু ইন্দ্রনাথের স্পর্শে এমন কিছু আছে — মমতা, স্নেহ, কৃতজ্ঞতা, যা তার সমস্ত অস্তিত্বকে যেন আলোড়িত করে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে এত মূল্যবান এত দুর্লভ কিছু তার প্রাপ্য নয়। সে যেন অনধিকারীর মতো এসব আদায় করে নিচ্ছে।

ভেতরে ভেতরে সঙ্কোচে কুঁকড়ে যায় মালতী। কুণ্ঠিতভাবে বলে, 'আমি নিজেই হাঁটতে পারব। দয়া করে আপনি আর অপরাধী করবেন না।'

ব্যস্তভাবে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'না না, তুমি পারবে না। শরীর এখনও যথেষ্ট দুর্বল। একা একা হাঁটার চেষ্টা করলে পড়ে যাবে।'

একটু ভেবে মালতী বলে, 'তবু চেষ্টাটা তো করতে হবে। অন্যেব ওপর নির্ভর করে থাকলে আমাদের মতো মানুষের কী চলে?'

'আরেকটু সুস্থ হও। তারপর নিজে নিজে হেঁটো।' নরম গলায় বলেন ইন্দ্রনাথ।

অস্বস্তিটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিল না মালতী। সে বলে, 'আমি আজ থেকেই একলা হাঁটব।'

মালতীর কণ্ঠস্বর এমন কিছু ছিল যাতে ভেতরে ভেতরে একটু খতিয়ে যান ইন্দ্রনাথ। ধীরে ধীরে তার কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলেন, 'ঠিক আছে, তুমি যখন চাইছ, হাঁটো। আমি এখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।' আসলে তিনি ভরসা করে দূরে যেতে পারছিলেন না। মেয়েটা যদি পড়ে যায় বিপদ হবে।

মালতী আর আপত্তি করে না। সে বাচ্চাদের মতো টলমল করতে করতে হাঁটতে

থাকে। অশক্ত পা তার শরীরের ভার রাখতে পারছে না।

তার দিকে সতর্ক চোখ রেখে পেছনে পেছনে পা ফেলছিলেন ইন্দ্রনাথ। টলতে টলতে মালতী যখন প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল সেই সময় তাকে দু হাতে ধরে ফেলেন তিনি। বলেন, 'দেখলে তো, কী কাণ্ড করতে যাচ্ছিলে! পড়ে গেলে ভীষণ মুশকিল হয়ে যেত। তখনই বললাম একা হাঁটতে চেষ্টা করো না, কিছুতেই শুনলে না।'

মালতী লজ্জা পেয়ে যায়। বলে, 'হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল। তাই—'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'আজ আর হাঁটাহাঁটির দরকার নেই। চল তোমার ঘরে যাওয়া যাক। এখন চুপচাপ শুয়ে থাকো।'

মালতীকে কোণের ঘরে শুইয়ে হল-ঘরে নিজের পড়ার টেবলের সামনে এসে বসেন ইন্দ্রনাথ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুনির্মল আসে। এমনিতে 'মুখার্জি সদন'-এ আসার আগে ফোন করে সে কিন্তু আজ ফোন না করেই এসেছে।

বেশ অবাকই হয়ে গিয়েছিলেন ইন্দ্রনাথ। বুঝতে পারছিলেন খুব জরুরি কাজ না থাকলে এভাবে কখনই আসত না সুনির্মল। তাকে বসতে বলে জিজ্ঞেস করেন, 'হঠাৎ এলে? নিশ্চয়ই খুব দরকার আছে, তাই না?'

সুনির্মল বলে, 'হ্যাঁ স্যার। একটা আর্জেন্ট ব্যাপারে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে বংশীকে ডেকে চা-মিষ্টি আনতে বলে সুনির্মলের মুখের দিকে তাকান ইন্দ্রনাথ। বলেন, 'এবার তোমার আর্জেন্ট ব্যাপারটা শোনা যাক।'

সুনির্মল বলে, 'আপনাকে আগেই জানিয়েছি ময়দানের সেই হুলিগানগুলোকে অ্যারেস্ট করে কোর্টে হাজির করা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, বলেছিলে।'

'ওদের এগেনস্টে মামলা শুরু হয়েছে। আপনাকে সাক্ষি দেবার জন্যে দু-একদিনের ভেতর কোর্ট থেকে তলব করা হবে। খবরটা পেয়ে বলতে এসেছি।'

'ঠিক আছে।'

একটু ইতস্তত করে সুনির্মল বলে, 'স্যার, ক্রিমিন্যালগুলো একজন ঝানু ল-ইয়ারকে লাগিয়েছে।'

সে কী বলতে চাইছে, বুঝতে না পেরে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'লাগাক না—'

'এমন ক্রিমিনাল ল-ইয়ার কলকাতায় দু-চারজনের বেশি নেই। ক্রস-একজামিন করে রাতকে দিন বানিয়ে ফেলতে পারে। এর জেরার সামনে পড়লে অনেক বাঘা পুলিশ অফিসারেরও হাঁটু কাঁপতে থাকে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ স্যার। লোকটা এমন সব এমব্যারাসিং প্রশ্ন করে—' সুনির্মলের মনোভাবটা

এবার যেন আন্দাজ করতে পারেন ইন্দ্রনাথ। সামান্য হেসে মজার গলায় বলেন, 'বুঝেছি। তোমার ধারণা, ওই ল-ইয়ারটি জেরা করে আমার প্যান্ট ঢিলে করে ছাড়বে—এই তো?'

সুনির্মল হকচকিয়ে যায়। ইন্দ্রনাথের মতো শ্রদ্ধেয়, রাশভারী মানুষ এ জাতীয় প্রায়-অশোভন শব্দ ব্যবহার করবেন তা যেন ভাবা যায় না। বিমূঢ়ের মতো সে তাকিয়ে থাকে। ইন্দ্রনাথ বলেন, 'তুমি ভেবো না সুনির্মল। যত বড় ল-ইয়ারই হোক, আমার মুখ দিয়ে ট্রুথ ছাড়া আর কিছু বার করতে পারবে না। আই উইল স্টিক টু দ্যাট।'

বংশী চা বিস্কুট এবং চিত্রকূট নিয়ে এসেছিল। সে সব খেয়ে একসময় বিদায় নেয় সুনির্মল।

আঠারো

সুনির্মল সেই যে এসেছিল তার দিন সাতেক বাদে মামলার তারিখ পড়ে। কাল সে ফোনে জানিয়ে দিয়েছে আজ সাড়ে ন'টায় এসে নিজে ইন্দ্রনাথকে সঙ্গে করে কোর্টে নিয়ে যাবে।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টাতেই 'মুখার্জি সদন'-এ চলে আসে সুনির্মল। ইন্দ্রনাথ এ সময় দুপুরের খাওয়া খান না। কিন্তু আজ এতকালের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল। আজ তিনি ব্রেকফাস্ট করেন নি, স্নান সেরে ভাত খেয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কোর্টে কতক্ষণ থাকতে হবে, তার তো ঠিক নেই। সুনির্মল আসতেই বেরিয়ে পড়লেন।

ইন্দ্রনাথদের কেসটা উঠল এগারোটার পর। ময়দানের তিন ক্রিমিনালকে একদিকে কাঠগড়ায় তোলা হল। তারপর প্রথম সাক্ষি দেবার জন্য ডাক পড়ল ইন্দ্রনাথের। অভিযুক্ত তিন বদমাসের মুখোমুখি অন্য একটা কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা খোপের ভেতর গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

কিভাবে যেন আগেই রটে গিয়েছিল, আজকের মামলায় বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও ঐতিহাসিক ইন্দ্রনাথ মুখার্জি সাক্ষি দেবেন। কোর্টরুমে তাই প্রচণ্ড ভিড়। কলকাতার সবগুলো কাগজের রিপোর্টাররাও হাজির হয়েছে।

আদালত থেকে ইন্দ্রনাথকে শুরুতেই হলফনামা পাঠ করানো হলো। সত্য ছাড়া তিনি মিথ্যে বলবেন না।

এরপর আগামী পক্ষের উকিল উঠে দাঁড়ালেন। লম্বা চওড়া বিশাল চেহারা।

সারা শরীরে থাকে থাকে চর্বি। গলা বলতে প্রায় কিছুই নেই, প্রকাণ্ড মাথাটা ঘাড়ের ওপর যেন ঠেসে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোটা নাক, পুরু লেন্সের চশমার ওধারে বড় বড় লালচে চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

চেহারাটা এমনই ভীতিকর যে তাঁর দিকে তাকালে সাক্ষীর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। নাম যতীশ সমাদ্দার।

সমাদ্দার পায়ে পায়ে ইন্দ্রনাথের দিকে এগিয়ে আসেন। সোজাসুজি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে গমগমে গলায় বলেন, 'আপনি তো শিক্ষাবিদ এবং ঐতিহাসিক?'

চেহারার সঙ্গে সমাদ্দারের কণ্ঠস্বরটি এমনই মানানসই যে মুহূর্তে শিরদাঁড়ায় কাঁপন ধরে যায়। আদালতে আগে কখনও আসেন নি ইন্দ্রনাথ, তার ওপর এমন একজন জবরদস্ত বাঘা ল-ইয়ার। ভেতরে ভেতরে বেশ অস্বাচ্ছন্দ্যই বোধ করেন তিনি। বলেন, 'হ্যাঁ।'

সমাদ্দার জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি জীবনে কখনও মিথ্যা বলেছেন?'

মুখ লাল হয়ে ওঠে ইন্দ্রনাথের। বলেন, 'এ কথা বলার মানে?'

ডান হাতের মোটা মোটা আঙুলগুলো হাওয়ায় নাড়তে নাড়তে সমাদ্দার বলেন, 'প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়, আদালতে আমরা ল-ইয়াররা প্রশ্ন করি, সাক্ষীদের উত্তর দিতে হয়। পালটা প্রশ্ন করার রীতি এখানে নেই। বলুন—হ্যাঁ কি না?'

ইন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন, এভাবে উলটো পালটা কথা বলে সাক্ষীকে ঘাবড়ে দেওয়া হয়তো সমাদ্দারের একটা কৌশল। তিনি বলেন, 'মিথ্যে বলার প্রয়োজন কখনও হয় নি।'

সমাদ্দার পরিষ্কার উত্তরটা শোনার পরও জিজ্ঞেস করেন, 'ভাল করে ভেবেচিন্তে বলছেন তো?'

ইন্দ্রনাথ আন্দাজ করে নেন, শুরুতেই তাঁর ওপর একটা মানসিক চাপ তৈরির ছক কষেছেন সমাদ্দার। মনে বিরক্তি বা উত্তেজনা থাকলে সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। তাতে বিরুদ্ধ পক্ষের ল-ইয়ারের সুবিধা। জেরায় জেরায় নাকাল করে তাঁর মুখ দিয়ে এমন কিছু বার করে নেবেন যাতে ক্রিমিনালরা বেকসুর খালাস হয়ে যাবে। কাজেই কোনোভাবেই মাথা গরম করলে চলবে না। খুব শান্ত স্বরে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'ভেবেচিন্তেই বলেছি।'

'ভেরি গুড। আচ্ছ প্রিন্সিপ্যাল মহাশয় এবার ওদের দিকে দেখুন—' বলে আঙুল বাড়িয়ে উলটো দিকে তিন অভিযুক্তকে দেখান সমাদ্দার।

নির্দেশমতো ইন্দ্রনাথ তাকান।

সমাদ্দার জিজ্ঞেস করেন. 'এই তিনটি ইয়াং ম্যানকে আগে আর কখনও দেখেছেন?'

এক মুহূর্তও চিন্তা না করে ইন্দ্রনাথ বলেন. 'দেখেছি।'

'কোথায়?'

'ময়দানে।'

'দিনের বেলা, না রাতে?'

'রাতে।'

'মাস তারিখ মনে আছে?'

'আছে।'

'বলুন কোন মাস, কোন বছর এবং কত তারিখ?'

ইন্দ্রনাথ নির্ভুল সব বল গেলেন।

সমাদ্দার পিঠের দিকে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে এবং ঘাড় নামিয়ে পায়চারি করে নিলেন। তারপর আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে দ্রুত বলে উঠলেন, 'আপনি যে তারিখ আর মাসের কথা বললেন সেটা শীতকাল—অ্যাম আই রাইট?'

সমাদ্দারের চলাফেরা এবং বাচনভঙ্গিতে চমকপ্রদ নাটকীয় উপাদান রয়েছে। মনে মনে একটু কৌতুকই বোধ করেন ইন্দ্রনাথ। তবে তার প্রতিফলন মুখের ওপর ফুটে ওঠে না। সংযত, গম্ভীর গলায় তিনি বলেন, 'বাংলায় ঋতুর হিসেব অনুযায়ী তাই হওয়া উচিত।'

তারিফের সুরে সমাদ্দার বলেন, 'ফাইন।' চোখ কুঁচকে কী ভেবে খানিক বাদে জিজ্ঞেস করেন, 'আমার দিকে তাকিয়ে বলুন সে দিন রাতে কুয়াশা পড়েছিল কি? চট করে উত্তর দিতে হবে না। খুব মনোযোগ দিয়ে স্মরণ করার চেষ্টা করুন।'

'চেষ্টা করতে হবে না। এই সময়টা যে কুয়াশা পড়ে সেটা বাচ্চা ছেলেরাও জানে।'

'তা হয়তো জানে। কিন্তু আমি একটা বিশেষ দিনের কথা বলছি। সেদিন পড়েছিল কিনা?'

'হ্যাঁ, পড়েছিল।'

'কী ধরনের কুয়াশা?'

'কী ধরনের বলতে?'

'পাতলা, না ঘন?'

'বেশ ঘন।'

সমাদ্দার কোনো অজানা কারণে রীতিমত উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। বলেন, 'চমৎকার

স্যার, চমৎকার।'

সমাদ্দারের এতখানি উচ্ছ্বাস ইন্দ্রনাথকে অবাক করে দেয়। তিনি বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকেন।

সমাদ্দার এবার বলেন, 'আচ্ছা, কলকাতা শহরে বেশির ভাগ রাস্তার আলো খারাপ—রাত্তিরে জ্বলেই না। নিশ্চয়ই এটা আপনি স্বীকার করবেন।'

মাথা হেলিয়ে ইন্দ্রনাথ জানান, এ বিষয়ে তিনি সমাদ্দারের সঙ্গে একমত।

সমাদ্দার বলেন, 'আপনার সহযোগিতার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ স্যার।'

পাবলিক প্রসিকিউটর তারাপদ গোলদার এ সব প্রশ্নোত্তর শুনতে শুনতে খুবই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন। এতক্ষণে তিনি মুখ খুললেন। বললেন, 'এ সব ইররেলিভেন্ট প্রশ্নের কী প্রয়োজন বুঝতে পারছি না। অকারণে আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট করা হচ্ছে।'

সমাদ্দার 'বাও' করার ভঙ্গিতে মাথা ঝুঁকিয়ে বলেন, 'আমার লার্নেড সহযোগীর অবগতির জন্যে জানাই আমার একটি প্রশ্নও অবান্তর নয়, বরং অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সেটা কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রমাণ করে দেবো।'

মধ্যবয়সী ম্যাজিস্ট্রেট গম্ভীর মুখে বসে ছিলেন। এবার বললেন, 'আমি মিস্টার সমাদ্দারকে অনুরোধ করব সাক্ষীকে যেন মূল মামলা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন।'

'ইয়েস মি লর্ড—' বলে ফের ইন্দ্রনাথের কাছে চলে আসেন। বলেন, 'এবার স্যার সেই রাতের ঘটনাটি এলাবোরেটলি বর্ণনা করুন।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'পুলিশকে আমি সবই বিস্তৃতভাবে জানিয়েছি।'

'তবু মহামান্য আদালতকে আরেক বার জানান।'

ইন্দ্রনাথ সেদিন যা যা ঘটেছিল তার অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে গেলেন।

সব শোনার পর সমাদ্দার বলেন, 'যে তিনটি হুলিগানের কথা বললেন তারা কারা?'

উলটোদিকের কাঠগড়াটা দেখিয়ে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'ওই তো দাঁড়িয়ে আছে।'

'আপনার চশমার পাওয়ার কত?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

কঠোর স্বরে সমাদ্দার বলেন, 'আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি সাক্ষীর কাঠগড়ায় উত্তর দেওয়ার জন্যে আপনাকে তলব করা হয়েছে। কোনো প্রশ্ন করার জন্যে নয়। প্রশ্নগুলো আমিই শুধু করে যাব। আশা করি আমার কথাটা মনে থাকবে। বলুন চশমার পাওয়ার কত?'

ইন্দ্রনাথ বুঝতে পারছিলেন এই ধুরন্দর ল-ইয়ারটি তাঁকে কোনো অতল গহ্বরের

দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। বললেন, 'আমার বাইফোকাল লেন্স। দূরের জিনিস দেখার জন্যে মাইনাস সেভেন, লেখাপড়ার জন্যে প্লাস টু পয়েন্ট ফাইভ।'

'এক্সেলেন্ট।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর সমাদ্দার কাঠগড়ার রেলিংয়ে হাত রেখে ইন্দ্রনাথের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার বিবরণ অনুযায়ী সেই শীতের রাতটিতে প্রচণ্ড কুয়াশা পড়েছিল। হ্যাঁ কিংবা না?'

'হ্যাঁ'—আস্তে মাথা হেলিয়ে দেন ইন্দ্রনাথ।

'আপনি আদালতকে জানিয়েছেন আপনার চশমার পাওয়ার মাইনাস সেভেন এবং প্লাস টু পয়েন্ট ফাইভ। তাই তো?'

'এ প্রশ্ন আগেও করেছেন।'

'আবারও করছি। হ্যাঁ কিংবা না?'

'হ্যাঁ।'

'সেদিন রেসকোর্সের পাশের রাস্তাগুলোতে নিশ্চয়ই সব আলো জ্বলে নি। কেননা আপনার বক্তব্য অনুযায়ী কলকাতার কোনো রাস্তাতেই কর্পোরেশনের সমস্ত আলো জ্বলে না। কারেক্ট?'

স্নায়ুগুলো টান টান করে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'সেদিন ওখানে সবগুলো রাস্তায় আলো জ্বলছিল কিনা আমার মনে নেই। তবে যেখানে ঘটনাটা ঘটেছিল সেখানে আলো ছিল।'

'শীতের রাতে কুয়াশায় আর অন্ধকারে সে আলোর জোর থাকার কথা নয়। তার ওপর আপনার চশমার পাওয়ার মাইনাস সেভেন। এই অবস্থায় যে দুষ্কৃতকারীরা সেদিন হামলা চালিয়েছিল তাদের নিশ্চয়ই আপনার পক্ষে স্পষ্ট করে দেখা সম্ভব ছিল না।'

'না, স্পষ্ট দেখেছি। ওরাই সেই ক্রিমিনাল।' আঙুল বাড়িয়ে ফের ওধারের কাঠগড়াটা দেখিয়ে দেন ইন্দ্রনাথ।

'এমনও তো হতে পারে আপনি যাদের দেখেছিলেন তাদের চেহারার আদল অনেকটা এদের মতো।'

'মতো টতো নয়, এরাই সেই ক্রিমিনাল।'

'আচ্ছা, আপনার কি এই তিন ইয়াং ম্যানের ওপর রাগ আছে?'

রীতিমত হকচকিয়ে যান ইন্দ্রনাথ। বলেন, 'কী আশ্চর্য, রাগ থাকবে কেন?

সেদিনই প্রথম ওদের আমি দেখি, তারপর আজ দ্বিতীয় বার দেখলাম।'

সমাদ্দার ফের এ প্রসঙ্গে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট ভারি গলায় বলে ওঠেন, 'আপনার অন্য কোনো প্রশ্ন থাকলে করুন।'

সমাদ্দার 'বাও' করে বলেন, 'ইয়েস মি লর্ড, অ্যাজ দা কোর্ট উইশেস।' ইন্দ্রনাথের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি পুলিশ এবং আদালতকে যে জবানবন্দি দিয়েছেন তাতে জানা গেছে একটি বারবনিতাকে ছোরা মারা হয়েছে।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'হ্যাঁ। এই ক্রিমিনালরা মেরেছে। এমনভাবে মারা হয়েছে যাতে তার মৃত্যু হতে পারত।'

'কিন্তু হয় নি।'

'না, হয় নি। ডাক্তাররা তাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন।'

'এবার আপনাকে যে প্রশ্নটি করছি সেটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন।'

'ঠিক আছে।'

'আপনাকে যদি বলি মেয়েটিকে বাঁচিয়েছে আপনার অর্থ?'

'হাসপাতালে ওর চিকিৎসা হয়েছিল। সেখানে আমার একটি পয়সাও দিতে হয় নি। পরে অবশ্য ওকে নার্সিং হোমে ভর্তি করে দিই। সেখানে কিছু টাকা খরচ হয়েছে।'

'একটি রাস্তার মেয়েকে বাঁচানোর জন্যে আপনার এত আগ্রহ কেন?'

'কারণ সে আমার প্রাণ এবং আমার মেয়ের সম্মান বাঁচিয়েছিল। কৃতজ্ঞতা আর মনুষ্যত্ব বলে শব্দ দু'টি এখনও কারো কারো মধ্যে টিকে আছে। আমি তাদেরই একজন বলে দাবি করছি।'

ইন্দ্রনাথের কথাগুলোর মধ্যে তীক্ষ্ণ একটু খোঁচা ছিল। সেটা যেন সমাদ্দারকে উসকে দেয়। তিনি বলেন, 'ওয়েল, এর আগেও কি এ জাতীয় মেয়েদের ব্যাপারে আপনার কৃতজ্ঞতা আর মনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটেছে?'

গোটা কোর্ট রুমটি জুড়ে চাপা হাসির শব্দ শোনা যায়। সেই সঙ্গে দর্শকদের গুঞ্জন এবং নানারকম মন্তব্যও চলতে থাকে।

হাতুড়ি ঠুকে বিরক্ত বিচারক ভারি গলায় বলেন, 'অর্ডার অর্ডার।'

মুহূর্তে আদালত কক্ষের যাবতীয় শব্দ থেমে যায়।

এদিকে পাবলিক প্রসিকিউটর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি প্রায় হুমকে ওঠেন, 'অবজেকশান মি লর্ড। আমার লার্নেড সহযোগী অনাবশ্যক প্রশ্ন করে ফের আদালতের মহামূল্য সময় অপচয় করছেন।'

ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, 'অবজেকশান সাসটেনড। অভিযুক্ত পক্ষের আইনজ্ঞ অন্য

কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পরেন।'

সমাদ্দার বলেন, 'ধন্যবাদ মি লর্ড।' তারপর নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেন, 'যে বেশ্যাটির জন্যে আপনি সাক্ষি দিতে এসেছেন তার সঙ্গে আগে কোনো সম্পর্ক ছিল আপনার?'

পাবলিক প্রসিকিউটর বাঘাটে গলায় গর্জে ওঠেন 'অবজেকশান মি লর্ড।'

বিচারক কোনো মন্তব্য করার আগেই সমাদ্দার বলে ওঠেন, 'ঠিক আছে, প্রশ্নটা ঘুরিয়ে করছি। মেয়েমানুষটির সঙ্গে আপনার আগে যোগাযোগ ছিল?'

'না।'

'সে এখন কোথায় আছে, জানেন?'

সমাদ্দার তাঁকে কোনো ফাঁদে ফেলতে চাইছেন কিনা, ইন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন না। সঠিক উত্তরটা দেওয়া ঠিক হবে কিনা যখন ভাবছেন সেই সময় সমাদ্দার প্রশ্ন করেন, 'আমাদের কাছে খবর আছে, মেয়েমানুষটা এখন আপনাদের বিখ্যাত 'মুখার্জি সদন'-এ রয়েছে। ইয়েস অর নো?'

পাবলিক প্রসিকিউটর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েন, 'এই মামলার সঙ্গে মেয়েটি কোথায় আছে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ইটস অ্যাবসোলুটলি ইররেলিভ্যান্ট।'

বিচারক বলেন, 'অবজেকশান সাসটেনড।'

সমাদ্দার মাথা ঝুঁকিয়ে বলেন, 'দ্যাটস অল মি লর্ড। আপাতত আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই।'

ইন্দ্রনাথ কাঠগড়া থেকে নেমে আসেন। কোর্টরুমের প্রায় দেড়শ জোড়া চোখ এখন তাঁর ওপর নিবদ্ধ। সবাই ফিসফাস করে কিছু বলছে। মালতীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে সমাদ্দার যে নোংরা ইঙ্গিত দিয়েছেন সে ব্যাপারে এই বাজে লোকগুলোর দারুণ উৎসাহ। আসলে মাছির বণ খোঁটার মতো মানুষও রগরগে কেচ্ছা ঘাঁটতে ভালবাসে। তার ওপর সমাদ্দার যখন খুঁচিয়ে দিয়েছেন তখন আর কথাই নেই।

শুনতে শুনতে কান ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে ইন্দ্রনাথের। কোনো দিকে না তাকিয়ে তিনি সোজা আদালতের বাহিরে বেরিয়ে যান। সুনির্মল তাঁর ওপর নজর রেখেছিল। সে-ও ছুটতে ছুটতে আসে। শুধু সে-ই নয়, কজন সাংবাদিকও ধাওয়া করে এসেছিল। তারা ইন্দ্রনাথকে প্রায় ঘিরে ধরে।

সুনির্মল বলে, 'সরে যান, সরে যান। ওঁকে যেতে দিন।'

কেউ এক পা-ও নড়ে না। চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলায় ইন্দ্রনাথকেও দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'আপনারা কারা?'

'আমরা রিপোর্টার।' যে যে কাগজে কাজ করে তার নাম জানিয়ে দেয়।

'আমার কাছে কী চান?'

'মিস্টার সমাদ্দার লাস্ট যে প্রশ্নটা করেছিলেন আপনি তার উত্তর দেন নি। মালতী নামে ওই মহিলাটি সত্যি সত্যি আপনাদের বাড়িতে আছে?'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকেন ইন্দ্রনাথ। তারপর বলেন, 'হ্যাঁ আছে। মানবতার খাতিরে তাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে এসেছি।'

'ওর একটা ইন্টারভিউ কি আমরা নিতে পারি?'

এবার সুনির্মল প্রায় ধমকে ওঠে, 'নো। এতক্ষণ উনি সাক্ষি দিয়েছেন। হি ইজ অ-ফুলি টায়ার্ড। ডোন্ট ডিসটার্ব হিম এনি মোর।' একরকম জোর করেই ইন্দ্রনাথকে নিয়ে কোর্ট কমপাউন্ডের ভেতর পার্কিং জোনে চলে যায় সে এবং গাড়িতে উঠে সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট দেয়।

উনিশ

পরদিন ভোরে রুটিন অনুযায়ী সূর্য ওঠার আগেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে চলে আসেন ইন্দ্রনাথ। সেখান থেকে ভ্রমণসঙ্গীদের নিয়ে অন্যদিনের মতো একই রুট দিয়ে রেসকোর্সের পাশের রাস্তা ধরে সোজা রেড রোডের দিকে হাঁটতে থাকেন।

প্রতিদিন বন্ধুদের মধ্যে যে সব আলোচনা হয়, আজও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। সেই ডিভিডেন্ড, শেয়ার, ব্যাঙ্ক ইন্টারেস্ট, গুরুদেবের দৈবশক্তি, রোগ ইত্যাদি।

হঠাৎ পুরনো সব প্রসঙ্গ থেকে নিজেকে বার করে এনে রাজশেখর ইন্দ্রনাথ সম্পর্কে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। বলেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।'

ইন্দ্রনাথ অন্যমনস্কের মতো হাঁটছিলেন। বললেন, 'কী কথা?'

'কাল কোর্টে তোমার কেস ছিল না?'

'হ্যাঁ।'

এবার অন্য সহযাত্রীরাও উৎসুক হয়ে ওঠেন। ব্লাড সুগার, শেয়ার, ডিভিডেন্ড ইত্যাদি জরুরি বিষয়গুলি আপাতত স্থগিত রেখে তাঁরা বলেন, 'আরে তাই তো। কেসটার কী হলো? উকিল কেমন জেরা টেরা করলে?'

এই মামলাটা নিয়ে আলোচনা করার আদৌ ইচ্ছা নেই ইন্দ্রনাথের। কেননা

মালতীর মতো একটা নরকের পোকাকে রাজশেখরদের মতো সম্ভ্রান্ত, প্রতিষ্ঠিত, সমাজের উঁচু চূড়ার মানুষরা ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই করে না। তার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই এঁদের। মালতীর প্রসঙ্গটা পারতপক্ষে ওঁদের কাছে তিনি তুলতে চান না। ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করেন তিনি। কিন্তু কেউ কিছু জানতে চাইলে তার একটা উত্তর দিতে হয়। তাই ভাসা ভাসা ভাবে বলেন, ' এ জাতীয় মামলায় যেমন হয় তেমনি।'

রাজশেখর বলেন, 'আরে বাবা, ডিটেলে বল।'

বিমলেশ বলেন, 'একটা প্রস্টিটিউট যখন এর সঙ্গে জড়িত তখন ল-ইয়ার বেশ চটচটে প্রশ্ন করেছিল, তাই না?'

আনন্দগোপাল বললেন, 'আমাকে একবার একটা ধর্ষণের মামলায় উইটনেস করেছিল। ক্রিমিনাল ল-ইয়ারদের মুখে কিছুই আটকায় না। যা সব প্রশ্ন করছিল তাতে মনে হচ্ছিল আরেকখানা নতুন কামসূত্র লিখে ফেলার এলেম আছে লোকটার। তেমন কিছু কিছু তোমাকেও নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করেছে?'

ইন্দ্রনাথ অল্প হেসে বলেন, 'বুঝতেই তো পারছ।'

'আরে বাবা, এত সংক্ষেপে সারতে চাইছ কেন? বিশদভাবে বল না—' চোখ কুঁচকে রোয়াকের ছোকরাদের মতো চটুল একটা ভঙ্গি করে বলেন আনন্দগোপাল।

ইন্দ্রনাথ লক্ষ করেন, আনন্দগোপালের মতো অন্য বন্ধুদের চোখেমুখেও মিচকে হাসি আটকে আছে। এঁরা সবাই উচ্চশিক্ষিত, মর্জিত এবং সুরুচিসম্পন্ন মানুষ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকের মধ্যেই লুকনো রয়েছে একটা করে লুচ্চা, সেক্সের গন্ধ পেলে যাদের জিভ দিয়ে লালা ঝরতে থাকে। ইন্দ্রনাথ বলেন, 'ও সব আজেবাজে কথা শুনে এই বয়েসে কী লাভ?'

সুধাময় বলেন, 'তুমি একেবারে টিপিক্যাল মাস্টারই রয়ে গেলে। পিউরিটান, রসকষের বালাই নেই।'

ইন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন না। বন্ধুদের কাউকেই এখন পর্যন্ত জানান নি, মালতীকে 'মুখার্জি সদন'-এ এনে রেখেছেন। জানাজানি হলে ওঁরা তাঁকে পাগল করে ছাড়বেন।

এরপরও আনন্দগোপালরা অনেক জোরাজুরি করলেন কিন্তু ইন্দ্রনাথের কাছ থেকে কালকের জেরা সম্পর্কে আর কিছুই আদায় করা গেল না।

যথারীতি প্রাতঃভ্রমণ চুকিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন ইন্দ্রনাথ। গাড়ি নিচের কমপাউন্ডে রেখে সোজা দোতলায় উঠে সিংহাসন-মার্কা তাঁর নির্দিষ্ট সোফায় গা এলিয়ে দেন। পাশেই নিচু সাইড-টেবলে চারখানা খবরের কাগজ ভাঁজ করে

পেপারওয়েট চাপা দেওয়া রয়েছে।

তিনি বসতে না বসতেই বংশী ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম এনে অন্য একটা টেবলে রেখে চলে যায়।

খানিকক্ষণ জিরোনোর পর টি-কোজির ভেতর থেকে টি-পট বার করে একটা কাপে ছাঁকনি দিয়ে লিকার ছেঁকে ঢেলে নেন। তার সঙ্গে দুধ আর একটা সুগার কিউব মিশিয়ে চামচ দিয়ে নেড়ে চা তৈরি করে ফেলেন। তারপর একটা চুমুক দিয়ে একখানা খবরের কাগজ তুলে নেন।

ইন্দ্রনাথের চিরকালের অভ্যাস সবার আগে প্রথম পাতার হেড লাইনগুলো পড়ে নেওয়া। তারপর ভেতরের পাতাগুলো দ্রুত দেখে নেন। আজও তাই করছিলেন। হঠাৎ তৃতীয় পাতার ডান দিকের কোণে আইন-আদালতের কলমটায় চোখ চলে যায়। সেখানে শিরোনামে বড় হরফে নিজের নামসুদ্ধ হেডিংটা দেখে চমকে ওঠেন। 'বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং শিক্ষাব্রতী ইন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আদালতে। বারবনিতা মামলার প্রধান সাক্ষী।'

কিছুক্ষণ থ হয়ে বসে থাকেন তিনি। তারপর শ্বাসরুদ্ধের মতো পড়ে যান। কাল ক্রিমিনাল ল-ইয়ার যে সব প্রশ্ন করেছিলেন এবং তার যা যা উত্তর তিনি দিয়েছেন আড়াই কলম ধরে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ বেরিয়েছে। সেই সঙ্গে এও জানানো হয়েছে বারবনিতা মালতীকে ঐতিহাসিক 'মুখার্জি সদন'-এ আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

হঠাৎ ইন্দ্রনাথের মনে পড়ে, আজ ভোরে যখন ময়দানে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তখনও ওঁদের কাগজ পড়া হয়নি। অত ভোরে কারো বাড়িতেই কাগজ আসে না। ল-কোর্ট রিপোর্টটা ওঁদের চোখে পড়লে তার পরিণতি কী হতো ভাবতে সাহস হয় না। তবে বাড়ি ফিরে ওঁরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে রিপোর্টটা পড়ে ফেলেছেন। যাঁরা এখনও পড়েন নি, কিছুক্ষণের মধ্যেই পড়ে ফেলবেন। কাল সকালে যখন ওঁদের সঙ্গে দেখা হবে ওঁরা কী বলবেন, কী ধরনের মন্তব্য করবেন, সেটা স্পষ্ট আন্দাজ করা যাচ্ছে। বন্ধুদের হাত থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা করা যায়, তার একটা কৌশল বার করতেই হবে।

কিন্তু পরদিন পর্যন্ত সময় পাওয়া গেল না, পাশের টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। কয়েক পলক তিনি সেটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে তুলে ধরেন। 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে আনন্দগোপালের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'কী ব্যাপার ইন্দ্রনাথ, অ্যাঁ? এ তো আমি ভাবতেই পারছি না।'

আনন্দগোপাল কোন বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন, বুঝতে অসুবিধা হয় না। ইন্দ্রনাথ চুপ করে থাকেন।

আনন্দগোপাল গলা আরো চড়িয়ে এবার বলেন, 'ভোরে মর্নিং ওয়াকের সময় কেন মুখ বুজে ছিলে, এতক্ষণে বোঝা গেল। তোমার এমন অধঃপতন হবে ভাবতেই পারি না।'

ইন্দ্রনাথ ভীষণ বিব্রতভাবে কী একটা কৈফিয়ৎ দিতে চাইলেন কিন্তু তার আগেই ঝড়াং করে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন আনন্দগোপাল।

দু মিনিট কাটতে না কাটতেই ফের ফোন বাজে। এবার সত্যজিৎ। তারপর একে একে সুধাময় এবং অন্য ভ্রমণসঙ্গীরা। পরে তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকেও ফোন আসে। শুধু তাঁরাই নন, পুরনো সহকর্মী, আত্মীয়স্বজন, ছাত্রছাত্রী এবং চেনাজানা অগুনতি মানুষ। যাঁদের সঙ্গে দীর্ঘকাল যোগাযোগ নেই, এমন অনেকেই ফোনের পর ফোন করতে থাকেন। সবাই তীব্র গলায় তাঁকে ধিক্কার দেন।

•

সকালের দিকেই না, সারাদিন ধরেই ফোন আসতে থাকে। সবারই এক কথা। এমন একজনকেও পাওয়া যায় না যার কাছে নিন্দা, ধিক্কার আর ছিছিক্কার ছাড়া অন্য কিছু শোনা গেল। স্পষ্ট করে না বললেও প্রত্যেকেই বুঝিয়ে দিল তাঁর চূড়ান্ত নৈতিক অবনতি ঘটেছে, নইলে একটি বারবনিতাকে কেউ বাড়িতে এনে তোলে না। পঁয়ষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত সংযত, নিষ্কলঙ্ক জীবনযাপনের পর তাঁর এমন মতিভ্রম কেউ মেনে নিতে পারছে না।

প্রথম দিকে ইন্দ্রনাথ সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, কোন পরিস্থিতিতে অসহায়, অসুস্থ মেয়েটাকে বাড়িতে নিয়ে আসতে হয়েছে। কিন্তু এ সব কেউ কানেই তোলে নি। কেউ যদি শুনতে না চায় তখন কিছুই করার থাকে না। শেষ দিকে নিরুপায় হয়ে সবার অভিযোগ আর ধিক্কার শুনেই গেছেন তিনি, নিজেকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টা করেন নি। কেচ্ছা বা স্ক্যান্ডাল ছাড়া মালতী সম্পর্কে অন্য কিছুই এরা ভাবতে পারে না। মানুষের মমতা, সহানুভূতি ইত্যাদি ব্যাপারগুলো বুঝিবা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। কথাটা যত ভাবেন ততই স্তম্ভিত হয়ে যান তিনি।

সন্ধের দিকে আলিপুর থেকে দেবকুমারের ফোন এল, 'সকালবেলা এক জায়গায় গিয়েছিলাম, খবরের কাগজ পড়া হয় নি। দুপুরে ফিরে এসে খাওয়াদাওয়ার পর কাগজ খুলে মাথা ঘুরে গেল। তারপর থেকে কত বার ফোন করেছি তার ঠিক নেই। যখনই ডায়াল করি আপনার লাইন এনগেজড।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'হ্যাঁ, সকাল থেকে আনবরত ফোন আসছে।'

দেবকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'মেয়েটা সত্যিই আপনার ওখানে আছে নাকি? নিজের চোখে রিপোর্টটা দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'নিউজপেপার মিথ্যে খবর ছাপবে কেন? অবিশ্বাস করার কারণ নেই বেয়াই মশাই।'

'এটা আপনি ঠিক করেন নি স্যার।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'এই কথাটা সকাল থেকে অন্তত একশ বার শুনেছি। কিন্তু মেয়েটাকে বাড়িতে নিয়ে আসার কারণ কেউ শুনতে চায় না। কারো সেই ধৈর্য নেই।'

দেবকুমারেরও ধৈর্যের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। এমনিতে তিনি খুব হাসিখুশি, আমুদে কিন্তু আজ তাঁর কথাবার্তা একেবারেই অন্যরকম। তিনি যে অত্যন্ত বিচলিত, গম্ভীর এবং উত্তেজিত, সেটা বোঝা যাচ্ছিল।

দেবকুমার বললেন, 'জানেন আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব রিপোর্টটা পড়ার পর আমাকে অস্থির করে তুলেছে। যাদের সঙ্গে অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই তারা পর্যন্ত ফোনে যা তা বলছে। ইন ফ্যাক্ট আপনাকে ডিফেন্ড করার মতো কোনো কৈফিয়ৎই আমার হাতে নেই।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'ডিফেন্ড করার প্রয়োজন তো নেই বেয়াই মশাই। আমি কোনো অপরাধ করি নি।'

তাঁর কথা শুনতেই চান না দেবকুমার। বলেন, 'আমার একটা কথা শুনুন স্যার। তা হলে এ সব স্ক্যান্ডাল এক্ষুনি বন্ধ হয়ে যাবে।'

'কী কথা?'

'মেয়েটাকে আজই বাড়ি থেকে বার করে দিন।'

'তা হয় না।'

'সোসাইটিতে থাকতে হলে অনেক কিছু মেনে নিতে হয়।'

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'সেটা আমি স্বীকার করি কিন্তু মালতীকে কিছুতেই চলে যেতে বলতে পারি না।'

ব্যগ্র স্বরে দেবকুমার বলেন, 'গোঁয়ার্তুমি করবেন না স্যার। আপনার জন্যে—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই লাইন কেটে দেন ইন্দ্রনাথ।

কুড়ি

মালতীর খবরটা কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। মুখার্জি পরিবারের হিতৈষী আত্মীয়স্বজন, এঁদের মধ্যে দেবকুমার এবং ইন্দ্রনাথের দুই শ্যালকও রয়েছেন—নিজেদের পয়সা খরচ করে নানা মহাদেশে ফোনে ইন্দ্রনাথের ছেলেমেয়ে,

স্ত্রী এবং জামাইদের খবরটা জানিয়ে দেন। শুধু তাই না, খবরের কাগজে মামলা সম্পর্কে যে রিপোর্ট বেরিয়েছে সব ফ্যাক্স করে পাঠান। চার মহাদেশে এই নিয়ে হুলুস্থুল শুরু হয়ে যায়। আর ছেলেমেয়েদের তীব্র প্রতিক্রিয়া অচিরেই জেনে যান ইন্দ্রনাথ।

প্রথম ফোনটা আসে নিউ ইয়র্ক থেকে। কর্কশ, ঝাঁঝাল স্বরে অশোক জিজ্ঞেস করে, 'এসব কী শুনছি বাবা?'

বড় ছেলে যে নাম না করে মালতীর কথা বলছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না ইন্দ্রনাথের। তিনি বলেন, 'ঠিকই শুনেছ। আমি মালতীকে বাড়িতে নিয়ে এসেছি।'

উত্তেজিত সুরে অশোক বলে, 'কেন? কেন?'

'কারণ সে আমার প্রাণ আর ছোট খুকির সম্মান বাঁচিয়েছে। তাছাড়া আমাদের জন্যে মারাত্মকভাবে উন্ডেড হবার পর পৃথিবীতে তার কোথাও যাবার জায়গা নেই। আমি মনে করি যে আমাদের জন্যে এতটা করেছে তার প্রতি মুখার্জি পরিবারের কর্তব্য আছে।'

'কিসের কর্তব্য? আমরা কি তাকে বাঁচাবার জন্যে ডেকেছিলাম? সে তো নিজের থেকে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঠিক আছে, শি ডিড সামথিং। তোমাকে তো কলকাতায় থাকতেই বলেছিলাম, কিছু টাকা দাও, দেন ফরগেট ইট। তা না, একেবারে বাড়িতে এনে তুললে!'

অশোক যে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত সেটা তার কণ্ঠস্বরেই টের পাওয়া যায়। কিন্তু সে এতটা হৃদয়হীন, ভাবতে পারেননি ইন্দ্রনাথ। যে মেয়েটা, সে যেমনই হোক, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তাঁদের রক্ষা করেছে, তার সম্পর্কে এ জাতীয় নিষ্ঠুর কথাবার্তা ইন্দ্রনাথকে উত্তেজিত করে তোলে। তিনি টের পাচ্ছিলেন ভেতরে ভেতরে ক্রোধ জমা হচ্ছে। তবু নিজেকে যতটা সম্ভব সংযত রেখে বলেন, 'আমি যা ভাল বুঝেছি তাই করেছি।'

অশোকের গলা আচমকা কয়েক পর্দা উঁচুতে চড়ে যায়। চিৎকার করে সে বলে, 'তোমার কাণ্ডজ্ঞান নষ্ট হয়ে গেছে বাবা। তোমাকে সেনিলিটিতে পেয়েছে। মেয়েমানুষটাকে আজই বাড়ি থেকে বার করে দাও।'

এই কথাটা আরো নরমভাবে, অনেকটা অনুরোধের সুরে বলেছিলেন দেবকুমার। কিন্তু অশোকের ভঙ্গিটা একেবারে মারমুখী। ইন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হয়ে যান। এভাবে কখনও এর আগে কথা বলেনি অশোক। এতকাল জেনে এসেছেন ছেলেমেয়েরা তাঁকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, হয়তো একটু ভয়ও পায়। মুখার্জি পরিবারে তাঁর কথাই শেষ কথা, তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তাঁকে বাধা দেওয়ার, তাঁর মুখের ওপর কথা বলার সাহস কারো নেই। আজ সেই ধারণাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ইন্দ্রনাথ রূঢ়ভাবে

কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, টের পেলেন অশোক লাইন কেটে দিয়েছে।

আধ ঘণ্টা পর টোরোন্টো থেকে অমিত ফোন করল, 'বাবা, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! একটা থার্ড ক্লাস প্রস্টিটিউটকে কেউ বাড়িতে এনে তোলে! 'মুখার্জি সদন'-এর স্যাংটিটি তুমি নষ্ট করে দিয়েছ।'

শান্ত স্বরে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'এ বাড়ির পবিত্রতা নিয়ে তোমরা যে এত মাথা ঘামাও এই প্রথম জানা গেল।'

কথাগুলোর মধ্যে তীক্ষ্ণ খোঁচা ছিল। অমিত প্রথমটা থতিয়ে যায়। তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না, কিক হার আউট।'

শুধু অশোক আর অমিতই না, লন্ডন থেকে অরুণ আর সিডনি থেকে অঞ্জনাও কটু ভাষায়, অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ইন্দ্রনাথকে একটানা এমন সব কথা বলে গেল, কয়েকদিন আগেও তা চিন্তা করা যেত না। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর মতিভ্রম হয়েছে, ভালমন্দের জ্ঞান তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর জন্য ছেলেমেয়ে, জামাই, পুত্রবধূ এবং নাতিনাতনিদের চূড়ান্ত ক্ষতি হয়ে গেছে। সাত সমুদ্র পেরিয়ে মালতীর ব্যাপারটা চার মহাদেশের বাঙালিদের মধ্যে এমন চাউর হয়ে গেছে যে, অঞ্জনারা কারো দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারছে না, ইত্যাদি।

ছেলেমেয়েদের ফোন এলেও স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া জানা যাচ্ছিল না। সেজন্য ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট শঙ্কিত হয়ে ছিলেন ইন্দ্রনাথ। সুপ্রভা কী ধরনের বিস্ফোরণ ঘটাবেন কে জানে।

শেষ পর্যন্ত নিউ ইয়র্ক থেকে অনিবার্য নিয়মে সুপ্রভার ফোন এল। অশোকদের অ্যাপার্টমেন্টে নয়, তিনি আছেন ছোট মেয়ে বিপাশা আর ছোট জামাই রোহিতের কাছে, ওদের নতুন সংসার গুছিয়ে দিচ্ছেন।

ছেলেমেয়েরা যেখানে শেষ করেছিল, আক্রমণটা ঠিক সেইখান থেকে শুরু করলেন সুপ্রভা, 'বাড়িটাকে একেবারে বেশ্যালয় করে তুললে?'

কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরত্ব থেকে তাঁর কণ্ঠস্বরের ঝাঁঝ কান ঝলসে দিল যেন ইন্দ্রনাথের। দিশেহারার মতো তিনি কী উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই সুপ্রভা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তোমার না পারিবারিক ট্র্যাডিশন, বংশগৌরব নিয়ে এত অহঙ্কার! তুমি না একজন শুদ্ধাচারী প্রিন্সিপ্যাল! বুড়ো বয়েসে একটা প্রস্টিটিউটের পাল্লায় পড়ে গেলে! ছিঃ—' একটু থেমে প্রচণ্ড ঘৃণায় পর পর তিন বার উচ্চারণ করলেন, 'ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ—'

সুপ্রভা কলকাতার বিখ্যাত পরিবারের মেয়ে—শিক্ষিত, ভদ্র, মার্জিত। কথায়বার্তায় আচরণে অত্যন্ত রুচিশীলা। কখনও গলার স্বর উঁচুতে তোলেন না,

অশালীন শব্দ ব্যবহার করেন না। তিনি যে এভাবে বলতে পারেন, একচল্লিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে আগে কোনোদিন ভাবতে পারেন নি ইন্দ্রনাথ। একের পর এক আক্রমণে বিপর্যস্ত হতে হতে একসময় খানিকটা সামলে নেন। বলেন, 'কী বলছ, একবার ভেবে দেখেছ! মাথাটা কি একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে!'

উন্মাদের মতো চিৎকার করে ওঠেন সুপ্রভা, 'মাথা আমার খারাপ হয়েছে, না তোমার? তুমি যে এত নোংরা, এত ইতর, এত জঘন্য হয়ে গেছ, কে ভাবতে পেরেছিল! আমি আর বাঁচতে চাই না, বাঁচতে চাই না, বাঁচতে চাই না।' গলার স্বর আরো, আরো উঁচুতে উঠতে থাকে তাঁর, 'এই বয়েসে এত অধঃপতন তোমার! ছেলেমেয়ে, ছাত্রছাত্রী, আত্মীয়স্বজনেব কাছে চমৎকার দৃষ্টান্ত রাখলে!'

দিশেহারা হয়ে পড়েন ইন্দ্রনাথ। সুপ্রভা যেভাবে গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করছেন তাতে একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে তিনি বলেন, 'তোমার হাই ব্লাড প্রেসার, অত চেঁচিও না। শরীব খারাপ হবে। শোন সুপ্রভা, শোন। অবুঝ হয়ো না। মালতী আমাদের মেয়ের বয়সী। সে ছোট খুকি আর আমাকে—'

কিন্তু তাঁর কোনো কথাই বুঝিবা আর শুনতে পান না সুপ্রভা, হিস্টিরিয়ার ঘোরে চেঁচিয়ে যান। আর এই একটানা তীব্র চিৎকারের মধ্যে আচমকা ফোনটা থেমে যায়।

কী হল? কী হতে পারে? হঠাৎ চুপ করে গেলেন কেন সুপ্রভা? উদ্বিগ্ন স্বরে ইন্দ্রনাথ বার বার স্ত্রীকে ডাকতে থাকেন, 'সুপ্রভা, সুপ্রভা—'

ওধার থেকে সাড়া পাওয়া গেল না।

খুব ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত বোধ করেন ইন্দ্রনাথ। ভাবেন তাঁর ওপর রাগ করে লাইন কেটে দিয়েছেন সুপ্রভা। এই মহিলা একচল্লিশ বছর তাঁকে দেখছেন। তাঁর স্বভাব, তাঁর অভ্যাস, তাঁর রুচি, জীবনযাপন পদ্ধতি, সমস্ত কিছুই সুপ্রভার জানা। তবু এই শেষ বয়সে নিজের স্ত্রী কিনা তাঁর দুই গালে চুনকালি মাখিয়ে দিল। মালতী 'মুখার্জি সদন'-এ না এলে জানাই যেত না, এই শিক্ষিত শোভন মধুরভাষী মহিলাটির ভেতর এমন একটা কুচুটে, সন্দেহপ্রবণ, ইতর মানুষ লুকিয়ে আছে।

তবু একবার ইন্দ্রনাথ ভাবলেন নিজেই ফোন করে জেনে নেবেন জিভ থেকে অগ্নিবর্ষণ করতে করতে হঠাৎ কেন লাইনটা কেটে দিলেন সুপ্রভা। পরক্ষণে স্থির করলেন, না, কোনোরকম যোগাযোগ করবেন না। ধীরে ধীরে ফোনটা নামিয়ে রাখতে রাখতে তাঁর চোখে পড়ে, কখন যেন মালতী হুইল চেয়ার চালিয়ে নিঃশব্দে টেবলের ওধারে চলে এসেছে এবং মলিন মুখে পলকহীন তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

চোখাচোখি হতে রুদ্ধ গলায় মালতী বলে, 'আমার একটা কথা ছিল—'

ইন্দ্রনাথ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকান, 'বল—'

'আপনি আমাকে চলে যেতে দিন।' বলতে বলতে মালতীর দু চোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরতে থাকে।

ইন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন ফোনে সুপ্রভাকে তিনি যা বলেছেন সবই শুনেছে মালতী। সুপ্রভার কথা না শুনলেও আন্দাজ করে নিতে অসুবিধা হয়নি। অত্যন্ত দৃঢ় স্বরে ইন্দ্রনাথ বলেন, 'না, তুমি কোথাও যাবে না। এখানেই থাকবে।'

'কিন্তু—'

'আবার কী?'

'আমার জন্যে বারবার সবাই আপনাকে অপমান করছে। তাই—'

'সে সব আমি গ্রাহ্য করি না।'

একুশ

সুপ্রভা যে শেষ বার ফোনটা করেছিলেন, তারপর দিন সাতেক কেটে যায়। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন ইন্দ্রনাথ, এই সাত দিনে স্ত্রী তো বটেই, ছেলেমেয়ে, জামাইরা কেউ একবারও তাঁকে ফোন করেনি। সাত-আট বছরের ভেতর এই প্রথম নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল। তিনি বেশ উৎকণ্ঠিতই হয়েছেন কিন্তু নিজে থেকে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। যেচে কে অসম্মানিত হতে চায়?

এই সাত দিনে দীর্ঘকালের অভ্যাসেরও অনেকটাই হেরফের ঘটেছে। এর মধ্যে একদিনও প্রাতঃভ্রমণে যান নি ইন্দ্রনাথ। এতকালের শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য তাঁর কিন্তু বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই।

এই ক'টা দিন সকাল-বিকেল-সন্ধে, লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে সময় করে অনেকক্ষণ মালতীর সঙ্গে গল্প করেছেন ইন্দ্রনাথ। গল্প আর কী, বাঙালির ইতিহাস খুব সহজ করে তার বোধগম্য ভাষায় শুনিয়েছেন। আর নিবিষ্ট শ্রোতার মতো শুনে গেছে মালতী।

সাত দিন পর বিস্ফোরণ ঘটে গেল যেন। পৃথিবীর চার বিখ্যাত মেট্রোপলিস থেকে তাঁর ছেলেমেয়েরা একের পর এক ফোন করে প্রথমে যে দুঃসংবাদটা দিল তা এইরকম : সেদিন ইন্দ্রনাথের সঙ্গে টেলিফোনে চেঁচামেচি করতে করতেই ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায় সুপ্রভার। তারপর ক'দিন তাঁকে হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রাখা হয়। গতকাল রাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকার পর ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেছেন, 'অ্যাটাকের খবরটা আগে দাওনি কেন?'

ছেলেমেয়েরা বলেছে, 'দিয়ে কোনো লাভ হতো না।'

মৃত্যুসংবাদ দেবার পর তারা আরো বলেছে, 'তুমি আর ওই মেয়েমানুষটা আমাদের মাকে খুন করলে। য়ু আর কিলারস। মায়ের শ্রাদ্ধ চুকে গেলে দেশে ফিরে প্রস্টিটিউটটাকে লাথি মেরে বাড়ি থেকে বার করে দেবো।'

ইন্দ্রনাথের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে শুধু, তিনি কোনো উত্তর দেননি।

এরপর নিজের মতো করে 'মুখার্জি সদন'-এই সুপ্রভার পারলৌকিক কাজ করেছেন ইন্দ্রনাথ। সে সব চুকলে 'ঘোষ অ্যান্ড দয়াল' সলিসিটর ফার্মের সিনিয়র পার্টনার রাজেশ্বর ঘোষকে বাড়িতে ডাকিয়ে এনেছেন। এঁরাই তাঁদের বিপুল সম্পত্তির আইনসংক্রান্ত পরামর্শদাতা।

ইন্দ্রনাথ বলেন, 'আপনাকে আমাদের প্রোপার্টি লিস্ট দিয়ে একটা দলিল ড্রাফট করতে বলেছিলাম। সেটা কি তৈরি হয়ে গেছে?'

রাজেশ্বর ঘোষ বলেন, 'সামান্য বাকি আছে।'

'আমি উইলটা পালটাতে চাই।'

'বেশ তো, চেঞ্জটা কী হবে যদি বলে দেন—'

'হ্যাঁ, বলছি।' ইন্দ্রনাথ একটু চিন্তা করে শুরু করেন, 'শ্রীমতী মালতী দাস নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে মুখার্জি পরিবারের কন্যা শ্রীমতী বিশাখার সম্মান এবং শ্রীইন্দ্রনাথ মুখার্জির জীবন রক্ষা করেছেন। তা ছাড়া আমাদের বংশের গৌরবময় ট্র্যাডিশন সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ যতদিন তিনি জীবিত থাকবেন, সসম্মানে 'মুখার্জি সদন'-এ বাস করার অধিকার তাঁকে দেওয়া হলো। সেই সঙ্গে নগদ দশ লক্ষ টাকা। তাঁর মৃত্যুর পর এই বাড়ি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করা হবে এই শর্তে যে 'মুখার্জি সদন'-কে জাতীয় স্মৃতিসৌধ হিসেবে তাঁরা রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। শ্রীমতী মালতীকে দেবার পর নগদ টাকা-পয়সা, কোম্পানির শেয়ার ইত্যাদি যা বাকি থাকবে আমার ছেলেমেয়েরা ইচ্ছা করলে সমানভাগে ভাগ করে নিতে পারে। তাদের আপত্তি থাকলে সব কিছু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাবে।' বলতে বলতে পাশাপাশি স্বয়ংক্রিয় কোনো পদ্ধতিতে একটা চিন্তাও চলছিল। তিনি নিজে এখনও প্রায় অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী। আরো আট-দশ বছর নিশ্চিত বেঁচে যাবেন। তার মধ্যে মালতীকে এ বাড়ির ট্র্যাডিশনের উপযুক্ত করে গড়ে তুলবেন।

রাজেশ্বর শুনতে শুনতে চমকে উঠেছিলেন। বলেন, 'কিন্তু স্যার—'

'কী?'

'ওই মেয়েমানুষটা, মানে শ্রীমতী মালতী দাসকে—' বলতে বলতে থেমে যান রাজেশ্বর।

মালতীর খবর চেনা মহলে জানাজানি হতে বাকি নেই। রাজেশ্বর জানবেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাঁর মনোভাব বুঝতে পারছিলেন ইন্দ্রনাথ। এ ব্যাপারে কোনোরকম মন্তব্য না করে বলেন, 'আপনাকে যা বললাম দলিলে তাই থাকবে। আমি উন্মাদ হয়ে যাই নি। সজ্ঞানে, সুস্থ মস্তিষ্কে কথাগুলো বলছি। ড্রাফটটা করে আমাকে একবার দেখিয়ে নেবেন। এক সপ্তাহের ভেতর ওটা রেজিস্ট্রি করতে চাই।'

বিমূঢ়ের মতো মাথা নাড়েন রাজেশ্বর।